

# Stockholm Sarbojonin Puja Committee



# লিখন

শারদীয় পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ, ১৪২৪ বং

**LIKHON 2017**

**SSPC's YEARLY PUJA MEGAZINE**

# পূজা নির্ঘন্ট

ষষ্ঠকহেল্পু সার্বজনীন পূজা কমিটির  
শ্রী শ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় নির্ঘন্টঃ

(দেবীর নৌকায় আগমন। ফল- শস্যবৃক্ষ ও বন্যা,  
দেবীর ঘোটকে গমন। ফল ছত্রভঙ্গ )



১১ই আশ্বিন, ২৮ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

পূজারাস্তঃ বিকাল পাঁচ ঘটিকা।

শারদীয়াদেবীর বোধন, ষষ্ঠবিহিত পূজা, সপ্তমীবিহিত পূজা ও  
অষ্টমীবিহিত পূজাতে সন্ধিপূজা ও বিশেষ হোম।

১২ই আশ্বিন, ২৯শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

পূজারাস্তঃ বিকাল পাঁচ ঘটিকা।

শারদীয়াদেবীর মহানবমীবিহিত পূজা।

১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, শনিবার।

পূজারাস্তঃ ১১ ঘটিকায়

শারদীয়াদেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপনে বিসর্জন,  
সিঁড়ুর খেলা ও বিজয়ার আলিঙ্গন।

২০শে অক্টোবর, শুক্রবার, শ্রী শ্রী শ্যামাপূজা

পূজারাস্ত - বিকাল ৪ ঘটিকায়

অঞ্জলী - সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায়

২১শে জানুয়ারি ২০১৮, রবিবার, সরস্বতী পূজা

পূজারাস্ত - সকাল ১১ ঘটিকায়

অঞ্জলী - দুপুর ১ ঘটিকায়

## প্রচন্দ ভাবনা

দেবীপক্ষের প্রথম প্রভাতে পুরুষজাতি তর্পন করেন সমাজের বিদেহী আত্মাদের শান্তি কামনায় , বেজে ওঠে আগমনী সুর , মা আসেন মর্ত্যে ,  
পুরুষই হয়ে ওঠে তার প্রধান পূজারী , নারীরূপী মা আত্মপ্রকাশ করেন পুরোহিত ও ভক্তদের ধ্যানে , জ্ঞানে, মননে। আবার সেই পুরুষজাতি  
সমাজের শত সহস্র দুর্গাদের প্রতিমুহূর্তে করে লাখিত, বর্ষিত , নিপীড়িত , কখনো ছেট ছেট দুর্গারা ভ্রনেই হয়ে হত্যার শিকার। সমাজ যেন ভুলে  
যায় যে নারী হলো সমাজের ধারক ও বাহক। তারাই হলো প্রকৃতি , সমাজের কল্যানে তারা হয়ে ওঠে দশভূজা অথবা অন্নপূজা , যেকোনো ক্ষেত্রেই  
তারা সম্পূর্ণ। প্রচন্দে নারীর অবয়বে নিছকই আর পাঁচটা নারীর মতো কোনো নারী, যে হয়তোৱা সুরূপা নয়, কিন্তু যার ছায়ায় যেন উজ্জীবিত ও  
উদিত হচ্ছেন মা মমতাময়ী জননী উমা মা। উমামা যেন সমাজের প্রতিটি নারীর ছায়ায় উজ্জীবিত ও উদিত হন। একটিও নারীকে অপমান মানে উমা  
মায়ের অপমান, সমাজের অত্যাচারে একটি নারীর মৃত্যু মানে দূর্গাসন্ত্বার মৃত্যু , উৎসবের মৃত্যু , আড়ম্বরের মৃত্যু, পৌরুষত্বের মৃত্যু।

- প্রচন্দ চিত্রায়নে জয়িতা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, ভাবনা ও লিখনে অয়ন চক্রবর্তী



## -: সূচীপত্র :-

### পূজা প্রবন্ধ :

- একদণ্ড ... গজাননম - বিষ্ণু চক্রবর্তী (পৃ- ৬)
- শারদীয় দুর্গোৎসব - রঞ্জন মিত্র (পৃ- ৮)
- কোলকাতার প্রথম পুজো - শুভদীপ রায় চৌধুরী (পৃ-১০)
- সাধারণ থেকে অসাধারণ... - দীপাঞ্জিতা চৌধুরী (পৃ-১১)
- বাস্তুশাস্ত্রঃ স্থাপত্য বিদ্যা - গৌতম সাহা (পৃ-১৮)
- আনন্দ করে নাও... - প্রিয়রঞ্জন ভক্ত (পৃ-১৬)
- মানবতার জয় হোক - রামেন্দু মজুমদার (পৃ-১৮)
- আমার ফিরে দেখা - স্বপন চট্টোপাধ্যায় (পৃ-১৯)
- বৃষ্টিভেজা চৌরঙ্গী - পাঞ্জিজন্য ঘটক (পৃ-২১)
- হন্তুরাসে হাহাকার - রঞ্জন ঘোষাল (পৃ-২৪)
- পরীরা এখনো আছে - সৌমিত্র চ্যাটার্জি (পৃ-২৬)

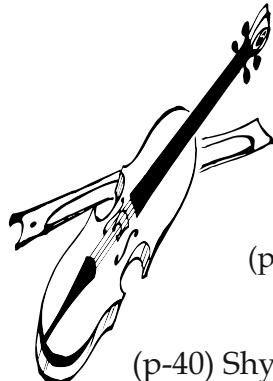
### কবিতা সমগ্র :

- আগমনী - নমিতা সেন শর্মা (পৃ-৪২)
- শরতের আগমনী - অঞ্জলি সেনগুপ্ত (পৃ-৪২)
- সেই সংগ্রাম - শিল্পী চৌধুরী (পৃ-৪৩)
- বিশ্বাসে অপরাধ আছে - রঞ্জিত চৌধুরী (পৃ-৪৩)
- বিজ্ঞানের প্রতি সাহিত্যের চিঠি - সঞ্জীব দাস (পৃ-৪৪)
- চিরন্তনের ধারায় - শিল্পী চৌধুরী (পৃ-৪৪)
- দৃগগা দৃগগা - শুভজিত চন্দ (পৃ-৪৫)
- মানুষ না হবার প্রার্থনা - রঞ্জিত চৌধুরী (পৃ-৪৫)
- বাসনা কামনা - শিবেন্দু দেব (পৃ-৪৬)
- দুটি না বলা কথা - শর্মি চক্রবর্তী (পৃ-৪৬)
- প্রতীক্ষা - শিবেন্দু দেব (পৃ-৪৭)
- সন্তান - মৌমিতা ঘোষ (পৃ-৪৭)
- বসন্তিকা - মধুরিমা সরকার (পৃ-৪৭)
- পাহাড় চূড়ায় - মধুমিতা আচার্য (পৃ-৪৭)
- অত্মগত প্রেম - স্বপন চট্টোপাধ্যায় (পৃ-৪৮)

### গল্প সমগ্র :

- ফেসবুক - দৃশ্য, অদৃশ্য - বিপ্লব সান্যাল (পৃ-৪৯)
- কুট যুদ্ধে বাঙালী - সুমিত বর্ধন (পৃ-৫০)
- মিকোর সঙ্গে একদিন - সুনীল কুমার সিংহ (পৃ-৫৩)
- বিদেশে বিজ্ঞানের বশে - সুপর্ণা সান্যাল (পৃ-৫৬)
- কিয়ানগঞ্জ ছাড়ল--- উজ্জ্বল (পৃ-৫৮)
- যাবি আমার পাহাড়ে? - সুচরিতা (পৃ-৬২)
- বকুলদার প্ল্যানচেটে - কুমার উৎপল (পৃ-৬৪)

- English Articles**
- (p-27) Sayani Pathak - My Stockholm visit
  - (p-28) Sagnik Palit - Invisible Tears
  - (p-30) Reshma Ghosh - Money Vs Happiness
  - (p-32) Srejith Nair - Come Alive
  - (p-34) Harvinder Singh - Climbing Himalaya
  - (p-35) Omkar - Home from school
  - (p-35) Omkar - The goodness thrives
  - (p-36) Anirban Ghosh - Grand Canyon...
  - (p-72) Ayon chakraborty - Tagore's Ark of Noah



### **Art works & Quiz**

- (p-29) Lets Find Out
- (p-48) Agneev Guin
- (p-44) Prosanta Bhoumik
- (p-63) Abantika Sengupta
- (p-78/32) Crossword & Solution

- Fashion & Kitchen**
- (p-40) Shyamasree Nandi -...Cause its Pujo(পৃ-৪১) মিতা সাহা - চিংড়ি বি঱য়ানি (পৃ-৪১)
  - (পৃ-৪১) বর্ণা সিংহ - ছানার মালাইকারি

### **Report**

Independence Day Made Special with Those Who Value Freedom The Most - Rwiddha Mitra (p-77)

### **Editorial Team**

JAIDEEP GUHA  
GOUTAM SAHA

### **Front Cover Design**

JAITA BHATTACHARYYA  
AYON CHAKRABORTY

### **Acknowledgement**

KAUSHIK SENGUPTA  
PRIYA RANJAN BHAKT  
AYON CHAKRABORTY  
DHRUBADITYA MITRA  
INDRANIL SINHA  
SANJIB DAS



### **CG Illustration**

SABBIR A KHAN

LIKHOON is a yearly puja magazine of Stockholm Sarbojonin Puja Committee (SSPC), Sweden. It's distributed free by SSPC. The writing and artwork herein were produced by and for SSPC members. The opinions in the articles are entirely the thoughts and views of the respective authors only and not that of SSPC.



## Acknowledgment from SSPC

Here with LIKHON, SSPC like to express their heartiest gratitude to the Indian Ambassador to Sweden, HE Monika Kapil Mohta for her able support to our celebration and to our organisation. Committee also like to extend gratitude to all the Embassy personal for their unrelenting support for SSPC. With the blessings of Ma Durga LIKHON expects stronger ties for our future endeavours.

Our Sponsors are vital energy for LIKHON thus for SSPC. Without their support and encouragement, it's impossible to continue with this literary platform. Here we thank our **Golden Sponsor Air India & Indian Curry House** for their trust on us. LIKHON likes to acknowledge and express gratitude for generous contributions from , ActionWave, Restaurant Samrat, Spice of India, India Dream, Ghandhi, Cardimom, Laxmi, Bhai-Bhai Lives, India Lord, N-Grossen, GRB Service Byrå, Cubane, GH Konsult, Hälsotek and Stockholm Bangla Movies. Here LIKHON committee like to express their gratitude to *Dr Gopal Dey* and to *Mr. Bisnu Chakraborty* for their extra ordinary support to this literary team.

On behalf of SSPC we like to thank to our numerous volunteers and members of all the subcommittees whose relentless efforts make this massive celebration possible.





## সম্পাদকীয়

দুর্গাপূজা... আহ! শুনলেই মন ভরে উঠে এক অনবিল আনন্দে... ফিরে আসে সেই শৈশব স্মৃতি। দেশ থেকে হাজারও মাইল দূরে চেষ্টা করি আমরা সেই আনন্দটা ধরে রাখতে। সেই চেষ্টা থেকেই ষষ্ঠকহোম সার্বজনীন পূজা কমিটির (SSPC) এই পূজার আয়োজন। ছোট থেকে বড় সবাই এই পূজায় আনন্দ করে। ‘লিখন’ সেই আনন্দে যোগ করে আরও একটি পালক।

ক্ষান্তিনেভিয়া থেকে ‘লিখন’ ই একমাত্র বাংলা পূজাবার্ষিকী যা দুর্গাপূজার সময় প্রকাশিত হয়। তাই SSPC এর সাথে সাথে লিখন এর জনপ্রিয়তাও দিনে দিনে বাড়ছে যা আপনারা লিখন এর এই সংখ্যায় দেশী ও প্রবাসী বাঙালী লেখকদের উপস্থিতি ও তাদের বিভিন্ন বিষয় এর উপর চমৎকার সব লেখা দেখলেই বুঝতে পারবেন। পুরাতন লেখকদের সাথে নতুন অনেক লেখক এর লেখা আমরা যোগ করেছি এই সংখ্যায়, তাই নতুন পুরাতন সব ধরনের লেখার স্বাদই আপনারা পাবেন আশাকরি।

সব ধরনের পাঠকের পেঁড়াক যোগানর চেষ্টা আমাদের সব সময়ই থাকে যা আপনারা বিগত সংখ্যা গুলোতেও দেখেছেন। তাই ধারাবাহিকতায়, এই চেষ্টার কোন অংশে কমতি এই সংখ্যাতেও ছিল না। আর তাই লিখন এর এই সংখ্যাকে আমরা এমন ভাবে সাজিয়েছি যেন সব ধরনের পাঠকরা খুব সহজেই তার পছন্দের লেখাটি খুঁজে পায়। চমৎকার কিছু বাংলা প্রবন্ধ দিয়ে শুরু তারপর স্বাদের ভিন্নতা আনতে ক্রমান্বয়ে এসেছে ইংরেজি প্রবন্ধ, কবিতা, ফ্যাশন, রেসিপি, ধাঁধা ইত্যাদি। ষষ্ঠকহোম যে বাঙালী কবিদের এক আড়াস্তুল এবং দিনে তা আরও সমন্বয় হচ্ছে তা এই সংখ্যার ১০ পৃষ্ঠার কবিতা সংগ্রহ দেখলেই বুঝতে পারবেন। ঘরের গৃহিণী ও বাচ্চাদের পূজার আনন্দও যেন কোনক্রমে কমতি না হয় তার জন্য এই সংখ্যাতে সুস্থান খাঁটি বাঙালী ঘরনার কিছু রাখার রন্ধন প্রণালী ও কচিকাঁচা দের আসর যোগ করা হয়েছে। সর্বশেষে সমাজের সুবিধা বাঞ্ছিত শিশুরাও যাতে সমাজে অন্য শিশুদের মত পূজার আনন্দ করতে পারে তার জন্য ষষ্ঠকহোম সার্বজনীন পূজা কমিটির যে প্রচেষ্টা তার উপর একটি প্রতিবেদন দিয়ে এই সংখ্যার যবনিকা টানা হয়েছে, যা কিনা লিখনের এই সংখ্যায় এনেছে একটি ভিন্ন মাত্রা।

লিখনের এই সংখ্যায় বাংলা কিংবা ইংরেজি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই লেখকদের লেখার স্বাতন্ত্র্যতা চোখে পরার মত। পুরাতন লেখকদের সাথে নতুন লেখকরাও সমান তালে লিখেছেন। সেই সাথে কিছু স্মার্মধন্য ব্যক্তিত্বের লেখা লিখনের এই সংখ্যাকে নিয়ে গিয়েছে এক অন্য উচ্চতায়। এছাড়াও দুর্গা পূজার ইতিহাস, সনাতন ধর্ম, রানি রাসমানি, WW-Iএ বাঙালীদের সাহসী অংশগ্রহণ, বাঙালী ফ্যাশন এবং বাঞ্ছিগত কিছু ভ্রমণ কাহিনীর উপর ষষ্ঠকহোম এর স্থানীয় লেখকদের সাথে দেশী লেখকদের লেখাগুলো সেই উচ্চতায় ছড়িয়েছে রং।

লেখকেরা হলো লিখনের প্রাণ এবং স্পন্দনরা যুগিয়েছে সেই প্রাণে শক্তি। তাই লেখক ও স্পন্দনদের আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা জানাই। লিখন একটা দলগত প্রচেষ্টা। লেখা সংগ্রহ থেকে শুরু করে প্রকাশনা পর্যন্ত লিখনের প্রতিটি সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্জনশীল চিন্তাভাবনার ফসল হোল এই লিখন। তাই লিখনের এই দলের প্রত্যেক সদস্যকে, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সমর্থন ছাড়া এই সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সর্বোপরি লিখনের এই সংখ্যা সবার পূজা সমাপ্তির বিষয়তাকে কাটিয়ে তুলবে এই আশা রাখি। সেই সাথে প্রতিবারের মত লিখনের এই সংখ্যার ভুল ক্রটিগুলো পাঠকগণ স্বীয়গুনে বিবেচনা করবেন বলে আশা করি। আসছে বছর লিখনের নতুন সংখ্যায় নতুন নতুন লেখা নিয়ে লিখনকে নতুন ভাবে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সবাইকে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

// জয়দীপ গুহ ও গৌতম সাহা





একদন্তং মহাকয়ং লম্বোদরং গজাননম  
শ্রী বিষ্ণু চতুর্বর্তী

‘স্বর্গচ প্রতিস্বর্গচ বংশো মস্তুরানিচ।  
বংশানুচরিতপৈব পুরাণং পথলক্ষণম।।’

- ১। স্বর্গ বা সৃষ্টিতত্ত্ব
- ২। প্রতিস্বর্গ বা পুনঃসৃষ্টি ও প্রলয়
- ৩। দেবতা ও পিতৃগণের বংশাবলী
- ৪। মনুর অধিকারকাল বা স্মত্র এবং বংশানুচরিত
- ৫। চন্দ্রসূর্য বংশীয়াদি নৃপতিগণের বংশবর্ণনা।

বেদভাষ্য সায়নার্য্য বলিয়াছেন যে, ‘বেদের অঙ্গত দেবসুরাদির যুদ্ধ বর্ণনার নাম ইতিহাস। জগতের প্রথম হইতে আরস্ত করিয়া সৃষ্টি প্রক্ৰিয়াৰ বিবৰণের নাম পুরাণ। উপরোক্ত পাঁচটি ধারা নিয়াই পুরাণ বিস্তৃত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুরাণের প্রচলন ছিল যেটা মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ পুরাণের পর্যালোচনা করিয়া সর্বমোট আঠারটি পুরাণের সন্ধান বাহির করিয়াছেন। যথাঃ ব্রাহ্ম্য, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্যত, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত, লৈঙ, বাৱাহ, ক্ষান্দ, বামন, কৌমু মাংস্য, গাৰুড় ও ব্ৰহ্মাণ্ড।

দশমপুরাণ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণ থেকে দেবতাদের জন্মাবৃত্তান্ত, মিলন সহ বহুবিধ ঘটন-অঘটনের বর্ণনা জানা যায়। যেমন, সৌতি নারায়ন ঋষি নারদের কথোপকথনের মাধ্যমে হৰ-পাৰ্বতী লীলা ও গণেশের জন্ম কথা সহ, দেবতাদের অনেক সংবাদ জানা যায়। দৈত্যদের সংহারান্তে মহাদেবী দক্ষকন্যা সতীৱৰ্পণে জন্মগ্রহণ করিয়া মহেশ্বর শিবকে পতিৱৰ্পণে লাভ করেন। পরজন্মে সতী হিমালয়ে মেনকার কণ্যা পাৰ্বতীৱৰ্পণে জন্মাভ করেন ও পুনৰায় শিবপত্নী হন।

দেবী পাৰ্বতী এই জন্মে পুত্ৰাভ এৰ আশায় সতী পুন্যকৰ্ত্ত পালন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশে জাত গণেশের জননী হন। পাৰ্বতী পুত্ৰকে দৰ্শনে সমাগত উপস্থিতি দেবমণ্ডলীৰ মধ্যে অবস্থিত শনিৰ দৃষ্টিপাতে মস্তক পতিত হইলে শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং সেখানে গজমুড় স্থাপন করেন। সেই হইতে দেব গণেশ গজানন। স্বয়ং বিঘ্নবিনাশন দীঘ্নৰাবতার দেব গণেশের জন্মে এ হেন বিঘ্নেৰ কাৰণ ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণের বৰ্ণনায়, দেব মহেশ্বৰ মহাদেবে সূর্যদেবের দুই পৰম ভক্ত মালী ও সুমালীকে শুলাভাত কৰিয়া বধ কৰিয়া ছিলেন। তখন মালী ও সুমালীৰ পিতা কশ্যপ পুত্ৰ শোকে কাতৰ হইয়া দেব মহেশ্বৰকে অভিশাপ কৰিয়াছিলেন যে, মহেশ্বৰ এই জন্মে বিছিন্ন পুত্ৰমুড় দৰ্শন কৰিবেন। গজাননেৰ এ হেন জন্ম দুর্ঘটনায় দেবতারা মৰ্মাহত কিষ্ট তাঁহাদেৱতো কিছু হইলেও কৰার আছে - সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যে কোন দেবদেৱীৰ পূজাতে সৰ্ব প্রথম দেব গণেশেৰ পূজা কৰিতে হইবে এবং তিনি সম্পৃষ্ট হইয়া সবাইকে আশীৰ্বাদ কৰিলে সকলেৰ বিঘ্নবিনাশ হইবে। সেই হইতে থেকে তিনি বিঘ্নবিনাশক। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণ বিশ্লেষণে এই রূপ দেবতাদেৱ একে আপৱকে প্ৰচুৰ অভিশাপেৰ বৰ্ণনা পাওয়া যায়।

যেমন, ঋষি যাঞ্জবল্ক তাঁহার গুৰুৰ অভিশাপে বিদ্যায়ীন হইয়াছিলেন। তারপৰ দেবী বিদ্যাদায়ীনী সৱস্বতীৰ বৰে শাপমুক্ত হইয়া অনেক বিদ্যা অৰ্জন কৰিয়াছিলেন। আবাৰ দেখুন এই বিদ্যার দেবী সৱস্বতী নিজেই লক্ষ্মী ও গঙ্গা দেবীৰ অভিশাপে নদীৱপা প্ৰাণ হইলেন।

দেব গণেশেৰ বিস্তৃত শৈশবকালে অনেক ঘটন অঘটনেৰ সৃষ্টি হইয়াছিল। জমদগ্নি - কার্তবীয়েৰ সংবাদে জানা যায় দেব গণেশেৰ দন্তভঙ্গেৰ কাৰণ। পৱশুৰাম বা ভৃগুৱাম দেব মহেশ্বৰ মহাদেৱেৰ শিষ্য সে গণেশেৰ জন্মেৰও অনেক পূৰ্বে। ভৃগুৱাম এৰ পিতা জমদগ্নি কপিলা-গাইকে রক্ষা কৰিতে গিয়া কার্তবীয়ায়নেৰ হাতে নিহত হন। ভৃগুৱাম তাঁহার পিতৃত্যাকাৰী কার্তবীয়ায়নকে তাঁহার কুঠার দিয়া হত্যা কৰিয়া পৃথিবী হইতে ক্ষত্ৰিয়দেৱ নিশ্চহ কৰিবাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰেন। মহাবীৰ ভৃগুৱাম শ্ৰীহীৰ কৰচ ধাৰণ কৰিয়া গুৰু মহাদেৱকে প্ৰণাম কৰিতে কৈলাসে আসেন। তখন শিব-পাৰ্বতী বিশামে ছিলেন, দেব গণেশ দৱজা রক্ষী ছিলেন, নিৰ্দেশ ছিল কোন ব্যক্তিকেই যেন ভিতৱে প্ৰবেশ কৰিতে না দেওয়া হয়। ভৃগুৱাম গণেশেৰ সে নিৰ্দেশ মানিয়া নিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, গজানন গণেশ



শাস্ত্রমতে আমি তোমার বড় ভাই আমাকে তুমি বাঁধা দেওয়ার কে ? কিন্তু দেব গণেশ পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করিবেন না বলিয়া  
স্পষ্ট জানাইয়ে দেন। ক্রুদ্ধ ভূগ্রাম এক পর্যায়ে তিনি, তাহার কুঠার দিয়া দেব গণেশকে আঘাত করিলে গজমুড়ধারী দেব গণেশের  
একটি দাঁত ভঙিয়া যায় এবং তিনি একদন্ত হইয়া পড়েন।

গণেশ জননী পার্বতী ক্রুদ্ধা হইয়া ভূগ্রামকে বধ করিতে গেলে দেব কৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করেন। তগবান কৃষ্ণের উপদেশে ভূগ্রাম দেব  
গণেশ ও গণেশ জননীর স্তব করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বিশ্লেষনে নারায়ন-খৰ্ষি তুলসী উপাখ্যানে দেব গণেশের আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন, সারাজীবন চিরকুমার থাকার  
প্রতিভায় অটল দেব গণেশ খুব সুদর্শন ছিলেন। প্রচণ্ড শক্তি ও সুদর্শন গণেশের রূপে মুক্ত হইয়া ধর্মধবজদুহিতা অপরূপা সুন্দরী যুবতী  
তুলসী পতিরূপে গণেশকে পাইবার বাসনায় একদিন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করেন। কিন্তু গণেশ রূপসী তুলসীকে অসুরগৃহীণী হইবার  
অভিশাপ দেন। নিরূপায় যুবতী সুন্দরী তুলসী বিঘ্নবিনাশ গজাননের স্তুতি করেন। দেব গণেশ তুলসী দেবীর স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া  
বলিলেন, ‘নারায়ন প্রিয়া তুমি হবে মোর বরে। পূজনীয়া হইবে তুমি পৃথিবী ভিতরে। কিন্তু শুনো মনোরমে কহিনু তোমায়, পারিত্যক্তা  
হইবে তুমি আমার পূজায়।’

সেই হইতে গণেশ পূজাতে তুলসীর ব্যবহার হয় না কিন্তু মর্তলোকে তুলসীর ব্যবহার অপরিহার্য। প্রতিটি পরিবারে তুলসী গৃহ দেবী।  
গজানন দেব গণেশ, সকলের বিঘ্ননাশ বিনাশন পরমারাধ্য।

‘ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রনামাম্যহম।’

প্রচন্দ সহায়িকাঃ

শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ - শ্রী কালী কিশোর বিদ্যাবিনোদয়





## শারদীয় দুর্গোৎসব রঞ্জন মিত্র

দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দুদের সবচাইতে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লা পক্ষের ৬ ষষ্ঠি দিন থেকে ১০ম দিন পর্যন্ত এর আনুষ্ঠানিকতা। পূজার ২/১ পূর্ব থেকে অর্থাৎ বিজয়ার পরও প্রায় মাসাধিক কাল পুনর্মিলননীর বহু অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ততা থাকে বলে বাঙালী হিন্দু সমাজের কাছে এই পূজা এক মহাপূজা।

পৌরাণিক মতে ঋষি মেধস এর নির্দেশে রাজ্য ভ্রষ্ট রাজা সুরথ ও পরিজন পরিত্যক্ত সমাধি বৈশ্য বসন্ত কালে প্রথম দুর্গা দেবীর এই রূপকে পূজা করে রাজ্যলাভ ও মোক্ষলাভ করেছিলেন। এই পূজা এখনও চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা নামে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এরপর শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের সময় দেবতাদের উপদেশ মতো অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দুর্গা পূজা করে রাবণকে হত্যা করে সীতাকে উদ্ধার করেন। কথিত আছে সগুষ্মী তিথিতে দেবী শ্রীরামচন্দ্রের তীর ধনুকে প্রবেশ করেন এতে তিনি মহাশক্তিশালী হন। অষ্টমীতে রাম রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণ পরাজিত হয় ও তার দশমুণ্ড ভূলুষ্ঠিত হয়। নবমীতে সীতা উদ্ধার ও দশমীতে শ্রী রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। অকালে এই পূজার প্রচলন হয়েছিল বলে এর অন্য নাম অকাল বোধন। পৌরাণিক মতে এভাবেই শরৎকালে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়।

যতটুকু জানা যায় বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ণ ঘোড়শ শতাব্দীতে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই পূজা প্রথমে শুরু করেন। সন্তবত বাঙালী সমাজে শ্রী রামচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতিবাহী হিসেবে শরৎকালের দুর্গাপূজাই প্রচলিত হয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। আগে এই পূজা সাধারণত জমিদারদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো কিন্তু রাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগের অবসানের পর গণতান্ত্রিক সমাজব্যবহার্য এখন সকলের সব রকম অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে এই পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাই একে বলা হচ্ছে বারোয়ারী দুর্গা পূজা।

দুর্গাপূজার কাঠামোতে থাকে মহাযোদ্ধার বেশে দুর্গা। পায়ের তলে ছিন্ন মণ্ডক মহিষ থেকে উঠে আসা মহিষাসুর। দেবী তার দশ হাতে দশ ধরনের অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছেন অসুরকে। দুর্গার বাহন সিংহও আক্রমণ করেছে মহিষাসুরকে। দুর্গার মাথার উপর শিব মূর্তি ও ডানপাশে লক্ষ্মী তার নীচে গণেশ। দেবীর বামপাশে সরস্বতী তার নীচে কার্তিক। বাহন হিসেবে দুর্গার পায়ের নীচে সিংহ, লক্ষ্মীর পাশে পেঁচা, গণেশের পায়ের পাশে ইঁদুর, সরস্বতীর পাশে হাঁস ও কার্তিকের পাশে ময়ূর।

এই প্রতীকী রূপের অভ্যন্তরে আছে এক সুগভীর দর্শন। সমাজ জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন সুনির্মাণের এক চেতনা। এই সাথে রাষ্ট্রীয় চেতনার এক বিরাট প্রকাশ রয়েছে এই কাঠামোতে।

জীবনে অশুভ অসুরশক্তির বিনাশ করে শুভ সুরশক্তির প্রতিষ্ঠাই দুর্গা পূজার শাশ্বত দর্শন। তাই দেবীর কাঠামোতে পার্থিব ভোগ সম্পদের প্রতি ব্যাপকভাবে আসন্ত মহিষরপী অসুরশক্তিকে পদদলিত করে শিব অর্থাৎ কল্যাণ মঙ্গলকে দুর্গা মাথার উপর ধারণ করেছেন, সুর শক্তির সহায়িকা দেবী শক্তির প্রতাকই দুর্গা। দেবী দশ হাতে দশ ধরনের অস্ত্র দিয়ে সংসারের দশ দিক এর অসুরের প্রাবল্যকে রোধ করার জন্য সংগ্রাম করেন। বাহন সিংহ পশুরাজ পশু শক্তির অধিপতি হয়ে অসুরকে আক্রমণরত অর্থাৎ যে কোনো সাধনার যুদ্ধের সময় দেহের পশুশক্তি ও সাধকের সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পাশে সরস্বতী বিদ্যাশক্তি বা জ্ঞানশক্তির প্রতীক বাহন তার হাঁস। হাঁস সার গ্রহণ করে অসার ত্যাগ করে। হংস হল প্রাণ, সাধক প্রাণে হিত হয়ে জ্ঞানামৃত পান করেন। কার্তিক দেব সেনাপতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় শক্তি যার বাহন ময়ূর। ময়ূর এর কামভাব অত্যন্ত ক্ষীণ। ময়ূর দেবশক্তির কাম ভাবহীনতার প্রতীক। লক্ষ্মী ধনশক্তি, বাহন পেঁচা। পেঁচা দিনে দেখে না, রাতে দেখে অর্থাৎ মানুষের বিপরীত। সাধক লক্ষ্মী অবস্থায় পেলে আধ্যাত্মিক গ্রিশ্য লাভ করেন তখন ঘোর অন্ধকারেও সে আলো দেখতে পায়। গণেশ গন শক্তি, স্থির সাধক, সাধনাকর্ণের প্রতীক। বাহন ইঁদুর অবিরাম অবিশ্বাস্ত কাটতে থাকে। তাকে বন্দী করা যায় না। তাই ইঁদুর গণেশের বাহন অর্থাৎ সহায়ক প্রতীক।

এই কাঠামোতে যে রাষ্ট্রীয় চেতনার তা হল একটি রাষ্ট্রকে মঙ্গলকর, শক্তিশালী হতে হলে চার শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী, সৈনিক, বাণিজ্য জীবী আর পেশাজীবী বা শ্রমজীবীর শুভ সম্মেলন না হলে একটি দেশ, একটি জাতি, একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না। তাই





একটি রাষ্ট্রকে সত্যিকার অর্থে শক্তিশালী করতে এই চার শক্তির সমান বিকাশ সাধন করতে হয়। এটি রাষ্ট্রীয় চেতনা হওয়া দরকার। এই পূজায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মালী, কুন্তকার, প্রতিমা গঠক, তন্ত্রবায়, নরসুন্দর থেকে শুরু করে সকল অংশের অংশ গ্রহণ করতে হয়। পূজার যে মহাম্নান সেখানে প্রয়োজন হয় নদ, নদী, সাগর, সরোবর, কুয়াশা ও ঝারনার জল। এই মহাম্নানেই লাগে পঞ্চ শস্য যব, গম, যুগ, তিল ও ধান যা কৃষি চিন্তাকে উজ্জীবিত করে।

প্রয়োজন পঞ্চবৰ্ত্ত- সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা, প্রবাল যা খনিজ সম্পদের চিন্তা বাড়ায়। প্রয়োজন হয় পঞ্চ কথা জাম, শিমুল, বেড়েলা, বকুল, কুল যা বনজ সম্পদের কথা ভাবায়। লাগে দুধ, ঘি, মিষ্টান্ন, ছানা, যা গো সম্পদের বাড়াবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বোষধী জলে দেবীকে ম্লান করাবার সময় দেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন এর দিকে দৃষ্টি পড়ে। বেশ্যা দ্বারের মাটি দিতে মনে পড়ে পতিতা উদ্ধারের চিন্তা ও নৈতিক অবক্ষয় চিন্তা। এককথায় দেশে যত কিছু উৎপন্ন হয় প্রায় সব কিছুই লাগে দুর্গা পূজায়। সমস্ত দেশ তথা বিশ্ব প্রসারী দৃষ্টি দুর্গাপূজায় জেগে ওঠে। এ ছাড়াও এই পূজায় দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন ঘটে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে এ পূজা তাই সার্বজনীন রূপ নেয়।

বাঙালী সমাজে দুর্গা দেবী ভক্তের কেবল ভক্তিই না ভক্তের কন্যা মেহও পেয়ে আসেন। পিতার ঘরে বিবাহিতা কন্যার আসবার আবহ আনন্দ আর পিতৃগৃহ থেকে কন্যা বিদায়ের বেদনার মাধ্যমে বাঙালী গৃহের এক অপূর্ব ছবিও ফুটে উঠে এই দুর্গোৎসবে। তাই বাঙালী হিন্দু সমাজে এই পূজার এতো প্রভাব।





## কোলকাতার প্রথম পূজো

### শুভদীপ রায় চৌধুরী

১৬১০ সালে লক্ষ্মীকান্ত শুরু করেন বাংলাদেশের প্রথম সপরিবার শ্রীদুর্গার পূজা। কার্তিক, গণেশ এবং মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গাকে আনলেন একই কাঠামোর মধ্যে। এক কথায় তিনিই বাংলাদেশে আধুনিক দুর্গাপূজার জনক। বড়িশা গ্রামে কাছারী বাড়ী সংলগ্ন জমিতে আটচালার চণ্ডীমণ্ডপ নির্মাণ করে মাতৃ-আরাধনার প্রবর্তন করেন। ইচ্ছা করলেই তিনি বিশাল অটালিকা করে রাজকীয় আভিজাত্যের মাধ্যমে দেবীপূজা করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না, যাতে তাঁর প্রজারা নির্ভয়ে একান্ত আপনার ভেবে মাতৃপূজায় অংশ নেয়। তাই বড়িশায় আদি চণ্ডীমণ্ডপের নাম "সাঁঁবার আটচালা" (সাঁবার অর্থে সবার)। এর থেকে অনুমান করা যায় লক্ষ্মীকান্ত প্রজা-দরদী ও বিচক্ষণ জমিদার ছিলেন। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীকান্তের অগণিত বংশধর পূজার পাঁচটি দিন জড়ে হয় পরিবারের ৮টি পূজাতেই। জায়গীরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অসংখ্য প্রজাদের জন্য পূজার পাঁচটি দিন জমিদার বাড়ী থাকতো অবারিত দ্বার। কোলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতালুটা (বর্তমানে সুতানুটি) এই তিনটি গ্রামের প্রজাসত্ত্ব তখনে হস্তান্তরিত হয়নি, ঠিক তখনি গ্রামের কৃষকদের ও প্রজাদের আনন্দ দান করার জন্য শুরু হল দুর্গার আরাধনা। কোলকাতার প্রাচীনতম দুর্গাপূজো শুরু হল বড়িশার আটচালাতে। গ্রামের জমিদার সার্বৰ্গ বংশের লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (রায় চৌধুরী) ও তাঁর স্ত্রী ভগবতীদেবী শুরু করলেন কোলকাতায় প্রথম সপরিবারে দেবীর আরাধনা, যা আজ ৪০৮বছরে পদার্পণ করল। রায় চৌধুরী পরিবারে দুর্গাপূজোর সময় গ্রামের কৃষকরা ও প্রজারা ভালোবেসে ও আনন্দে উপভোগ করত। বিদ্যাপতি রচিত "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" মতে পূজো হয়। এই পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য হল একমাত্র পরিবার যেখানে শ্রিধারা সংগমে পূজা হয়। বড়, মেজো ও নিমতাপাঠানপুর বাড়ীতে সিংহের মুখ ঘোড়ামুখো। আবার বড়বাড়ী ও বিরাটিবাড়ীতে অষ্টমীর বদলে নবমীতে হয় কুমারীপূজো। এছাড়া নিমতাপাঠানপুর বাড়ীতে খিরের পুতুল বলি হয়। চালচিত্রের পেছনে দশ মহাবিদ্যা অঙ্কিত থাকে। ডাকের সাজের মায়ের মূর্তির গায়ের রং বিধান অনুযায়ী হতে হবে শিউলি ফুলের বোঁটার মতোন বা স্বর্ণরং। এই পরিবারে কার্তিককে যুবরাজ হিসাবে পূজা করা হয়। কারণ আগে কার্তিক কৃষ্ণবর্ণের ছিল যা আদিবাসী সম্প্রদায়ে পূজো করা হত। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তই কার্তিককে যুবরাজ রূপে একচালায় নিয়ে আসেন। অনুমান করা হয় লক্ষ্মীকান্তের রং দেখে ও রূপদেখেই এই রকম কার্তিকের রূপ কল্পনা করা হয়েছিল। নবমীর দিন ১৮০টি খুরিতে মাষকলাই ভোগ নিবেদন করা হয় অসুর ও অপদেবতার জন্য। বড়বাড়ীতে অবিকল সন্ধিপূজার মতোন সপ্তমী ও অষ্টমীতে প্রথম ও শেষ ২৪মিনিট অর্ধরাত্রি বিহিত পূজো হয়। ষষ্ঠীর দিন কালীকিংকর বাড়ীতে সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠান হয় সেখানে "সার্ববর্তা" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সপ্তমীতে বড়বাড়ী ও নবমীতে বিরাটি বাড়ীতে ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়। দশমীর দিন কনকাঞ্জলি দিয়ে উমাকে বিদায় দেওয়া হয়। এই বাড়ীর পূজো একসময় স্মৃতিতীর্থ কিংবা কাব্যতীর্থ ছাড়া পুরোহিত পূজো করতে পারতেন না।

সার্বৰ্গ পরিবারে প্রতিমা একচালের হয় ও তার ত্রিচালা বসে। কৃষ্ণনবমীর দিন আটচালায় বোধন শুরু হয়। এই পরিবারে জন্মাষ্টমীর দিন হয় কাঠামো পূজো ও রাধাষ্টমীর দিন ১০০৮তার্থের মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রতিমার একদিকে মহাদেব ও অন্যদিকে রাম থাকেন, তাদেরও নিয়মিত পূজো হয়। এবার আসা যাক দেবীর অলংকার সম্বন্ধে। এই পরিবারে দেবীকে সব রকমের গয়নাই পরানো হয়। সোনার মুকুট, হীরের ঢুল, সোনার টিপ, চুলে রূপোর কাঁটা, সোনার রতন হার, হাতপদ্ম, কানপাশা, মানতাসা, হীরের রতন হার, সোনার চুর, নবরত্ন হার, সোনার বালা ইত্যাদি। সার্বৰ্গ বাড়ীতে আগে ১৩টা পাঁঠা ও ১টি মোষ বলিদান হত কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ হয়েছে।

বর্তমানে সার্বৰ্গ বাড়ীতে ৮টি দুর্গাপূজো হয়, বড়িশাতে ৬টি ও একটি নিমতাপাঠানপুর বাড়ী ও একটি বিরাটি। অষ্টমীর সন্ধিপূজাতে নিমতা বাড়ীতে কুলমাতা ভূবনেশ্বরীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। নবমীতে বিরাটি বাড়ীতে শুনোপোড়া হয়। সার্বৰ্গবাড়ীতে ৭টা বাড়ীতে আমিষ ভোগ হলেও নিমতাপাঠানপুর বাড়ীতে নিরামিষ ভোগ নিবেদন করা হয়। ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, চচড়ি, ভাজা মাছ, চাটনি, পায়েস ইত্যাদি পথওব্যঙ্গন সহকারে ভোগ হয়। সার্বৰ্গ বাড়ীতে অষ্টমীর সন্ধিপূজাতে ল্যাঠামাছ দেওয়া হয় (নিমতা বাড়ী ছাড়া)। বাড়ীর তৈরী মিষ্টি দেওয়া হয় যেমন - সার্বৰ্গ প্রাণমোহিনী, সার্বৰ্গ দ্বিধাপ্রাঙ্গলী, ফুলবাতাসা, মিষ্টি নিমকী, মিষ্টি গজা, বকুল পিঠে, পিঠেপুলি ইত্যাদি নানা রকমের। এই ভাবে আদি কোলকাতার প্রথম পূজো আজও একভাবে রীতি ও পরম্পরা বজায় রেখে চলে আসছে।

(লেখকঃ শুভদীপ রায় চৌধুরী, সার্বৰ্গ রায় চৌধুরী পরিবারের ৩৬তম বংশধর)



## সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠা এক বৈচিত্র্যপূর্ণ নারীর জীবনের টুকরো কথা দীপাষ্ঠিতা চৌধুরী

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ..... দানে-ধ্যানে, তেজস্বীতায়, ন্যায়পরায়ণতায় ও প্রজাহিতেষণায় এক মহিয়সী নারীর নাম তখন বাংলার ঘরে ঘরে। বছরে চেয়েও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল ওই পুণ্যশোকা নারীই হলেন "রানী রাসমণি"।

বাংলার ১২০০ বঙ্গাব্দে ১৩ই আশ্বিন ও ইংরেজি ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৯৩ খিষ্টাব্দে, হালিশহরের নিকটবর্তী কোনা গ্রামে মাতুলগ্রহে তাঁর জন্ম হয়, ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে অতিদরিদ্র পিতা হরেকৃষ্ণ দাস ও মাতা রামপ্রিয়া দেবীর কন্যা রাসমণির বিবাহ হয় কলকাতার জানবাজারের বিখ্যাত জমিদার প্রীতিরাম দাসের (মাড়) পুত্র রাজচন্দ্র দাসের সহিত মাত্র ১১ বছর বয়সে, তিনি ছিলেন রাজচন্দ্রের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

রানীর বিবাহের কয়েক বছর পরেই তাঁর শুশুর ও শাশুড়ি উভয় মারা যান। পিতার মৃত্যুর পর রাজচন্দ্র ব্যবসা ও জমিদারির হাল ধরলেও গুণবত্তী ও বুদ্ধিমত্তা রানী সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য সামলে স্বামীর বহু কাজেই সহযোগিতা করতেন। তাঁর সাথে পরামর্শ করে রাজচন্দ্র জমিদারী ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্ম করতেন। সেইসময় রাজচন্দ্র ও রানীর সমবেত প্রচেষ্টায় কতগুলি কাজ করেছিলেন, উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ্য যে - বাবুগাঁট ও আহিরাটোলায় গঙ্গায় স্নানের ঘাট নির্মাণ, নিমতলায় গঙ্গাযাত্রীদের থাকার জন্য গৃহনির্মাণ, তাঁর জমিদারিতে প্রজাদের চাষবাসের সুবিধার জন্য দীর্ঘ ও পুরু খনন, রাস্তা তৈরী প্রক্রিয়া। এছাড়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থও দান করেছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য ও সরকারি পার্টাগার (National Library ) তৈরির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনন্বিকার্য। শুধু তাই নয় "সতীদাহ প্রথা" নিবারণের জন্যও তাঁরা রাজা রামমোহনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

১২৪৩ সালে রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তি, পরিবার পরিজন ও প্রজাবর্গের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব সবাকিছুই রাসমণির উপর এসে পড়ে। প্রজা কল্যাণের হিতার্থে তিনি ন্যায়নিষ্ঠভাবে তাদের সমস্যা সমাধান করা শুরু করেন। এমনকি তাদের ওপর অত্যাচারের খবর পেলে তিনি অন্য জমিদার বা নীলকর সাহেবদের সাথেও সম্মুখ সমরে যেতে পিছপা হননি।

এইপ্রসঙ্গে দু একটি ঘটনা অবিশ্বরণীয়, যা না বললেই নয়। ঘটনাটি হল রানীর বাড়ির দুর্গাপুজোর সময় এক সাহেবের সঙ্গে মামলা নিয়ে - এক সঙ্গীর সকালে রাণীমার বাড়ির ব্রাক্ষণরা বাদ্যকারদের নিয়ে নবপত্রিকা স্নানের জন্য গঙ্গায় যাচ্ছিলেন তাঁরই স্বামীর তৈরী করা খাস রাস্তা দিয়ে। কিছুদূর গিয়ে পথের পাশে এক বাড়ি থেকে একজন সাহেব এসে বাজনা বন্ধ করতে নির্দেশ দেন, কারণ শব্দে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিলো। কিন্তু বাদ্যকারেরা সেই কথাকে উপেক্ষা করেও বাধা দেয়। ব্রাক্ষণরা রাণীমাকে ফিরে এসে সব কথা বললে তিনি ক্ষুঢ় হয়ে বলেন- সাহেবের ঘুমের জন্য ধর্ম কি বন্ধ করতে হবে? তিনি পরেরদিন আরো বেশি বাদ্যকারদের সেই স্থানে পাঠান। এই ঘটনায় সাহেবের আরো ভূং হয়ে পুলিশের কাছে শাস্তি ভঙ্গের অভিযোগ জানায়। ফলত রাণীমার ৫০ টাকা জরিমানা হয়। তিনি জরিমানা দিলেও হার মানেননি। উপযুক্ত প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি তাঁর ওই রাস্তা শালের খুঁটি দিয়ে বেড়া বানিয়ে বন্ধ করে দেন। এতে লোকজনের যাতায়াত ও যানবাহন চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় সরকারের পক্ষ্য থেকে প্রথমে আদেশ ও পরে অনুরোধ আসে রাস্তা খুলে দেওয়ার জন্য। রাণীমা তা উপেক্ষা করে বলেন- এটা তাঁর নিজস্ব জায়গা, তাই সরকারের এই বিষয়ে বলার কোনো অধিকার নেই। সরকার যদি জায়গা ও পথ নির্মাণের জন্য ন্যায্য মূল্য দেয় তবেই তিনি সরকারি অনুরোধ স্বীকার করবেন নচেৎ নয়। তৎক্ষণাত, রাণীর বিরক্তে কিছু উপায় করতে না পেরে, সরকার তাঁর সাথে আপোষ করে নেয়। জরিমানার টাকা ফেরতের পরিবর্তে রাস্তা খুলে দেওয়ার অনুরোধ করে। এই ঘটনার পর থেকে, সরকারি ভাবে একটা নিয়ম চালু হয়েছিল যা আজও চলে আসছে - সেই নিয়মটি হলো জনসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তায় যেকোনো রকম শোভাযাত্রা বের করতে হলে পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়াটা বাধ্যতামূলক।

শুধু উপরিউক্ত ঘটনাই নয় আরো একটি ঘটনার মাধ্যমে সরকারের কাছে রাণীমা তাঁর শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বীতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘটনাটি হল - একবার সরকার থেকে আইন জারি হয় যে গঙ্গায় জেলেরা মাছ ধরলে তাদের খাজনা দিতে হবে। এতে জেলেরা সমস্যায় পড়ে, এবং সমর্থন পাওয়ার আশায় কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ধর্ণা দেয়। কিন্তু তাঁরা কেউই জেলেদের কোনো অভয় দিতে না পারায় জেলেরা শেষমেশ রাণীমার শরণাপন্ন হয়। সমাধানস্বরূপ রাণী স্থির করেন গঙ্গায় যতটা জায়গা জুড়ে



জেলেরা মাছ ধরে সেই জায়গাটা তিনি সরকারের থেকে ইজারা নেবেন। তাঁর সিদ্ধান্তমতো কর্মচারীরা সরকারের সাথে যোগাযোগ করে এবং সরকার আয়ের লোভে রাণীমাকে ঘূসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত গঙ্গার জমাবিলি দিয়ে দেয়। এরপর তাঁর কর্মচারীরা ওই অঞ্চল নৌকার সারির সাহায্যে মোটা লোহার চেন দিয়ে ঘিরে দেয়। ফলত ওই জলপথে জাহাজ ও অন্যান্য জলযান যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই অচল অবস্থা সৃষ্টি হওয়াতে সরকার রাণীমাকে নির্দেশ দেয়ে পথ খুলে দেওয়ার জন্য ও জলপথ যেরাও এর উদ্দেশ্য জানতে চায়। পরিবর্তে, তিনি সরকার কে জবাব দেন যে উপযুক্ত খাজনা দিয়ে গঙ্গার এই অংশ তিনি জমা নিয়েছেন তাঁর জেলে প্রজাদের মাছ ধরার জন্য। ওই অংশ দিয়ে জাহাজ গেলে ও কলকাতা বন্দরের ঘাঁটি হলে মাছের সংখ্যা কমে যাবে। জেলেদের কাজে ব্যাপ্ত হবে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সঠিক বিবেচনা করেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর এই উত্তরে সরকার কোনো উপায় করতে না পেরে আপোষ করতে চায়। রাণীমা তখন বীরদর্পে বলেন যে- গঙ্গা দখল নেয়ার কোনো আগ্রহ তাঁর নেই, কেবলমাত্র বিনা খাজনাতে জেলেরা যাতে আগের মতো মাছ ধরতে পারে সেই ব্যবস্থা করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তাই সরকার যদি তাঁর কথা মেনে নেয় তাহলে তিনি জলপথ খুলে দেবেন। শেষমেশ সরকার রাণীমার সাথে সমরোতা করতে বাধ্য হয় ও জেলেদের খাজনামুক্ত ভাবে গঙ্গায় মাছ ধরতে অনুমতি দেয়। সেই থেকে আজও জেলেরা বিনা কর এ গঙ্গায় মাছ ধরে।

তৌক্ষৰী রাণী, বুদ্ধি দিয়ে শুধু ইংরেজ সরকারের সঙ্গেই লড়াই করেননি তিনি অন্ত্রসজ্জিত হয়ে গোরা সৈন্যদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গেই একটি ঘটনা খুব উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি হল- তখন সিপাহী বিদ্রোহের আগুন সবেমাত্র নিভেছে। বিদ্রোহের আগুন যাতে আর জুলে না ওঠে সেইজন্য সরকার বিভিন্ন জায়গায় গোরাসৈন্য মোতায়েন করেছে। সেইরকমই একটি সৈন্য ঘাঁটি ছিল রাণীমার প্রাসাদ এর কাছে জানবাজারের ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। একদিন আকস্মিক গোরা সৈন্যরা রাণীর বাড়ি আক্রমণ করলে বাড়ির দারোয়ানরা প্রাপ্তনে বাধা দেয়। কিন্তু সৈন্যরা সংখ্যায় বেশি থাকায় ও সঙ্গে আগেয়ান্ত্র থাকায় তারা বলপ্রয়োগ করে ভিতরে ঢুকে লুঠতরাজ শুরু করে। রাণীর জামাতারা কেউ সেইসময় উপস্থিত না থাকায় অকুতোভয় রাণী নিজেই তলোয়ার হাতে রুখে দাঁড়ান। গোরা সৈন্যরা সারাবাড়ি লুঠ করে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলে রাণীমা তাঁর রংগিনী মূর্তি প্রকাশ্যে আনেন ও দৃঢ়কঢ়ে বলেন কুলদেবতা (শ্রী রঘুনাথ জীউ) কে স্পর্শ যেন কেউ না করে। কিন্তু সৈন্যরা তাঁর এই আদেশকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখালে তিনি তরবারির আঘাত করতে বাধ্য হন এবং শেষমেশ সৈন্যরা হার সীকার করে পালিয়ে যায়।

রাসমণি বৈষ্ণব বৎশে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর ধর্মমত ছিল খুবই উদার এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তমতের অনুসারিনী। কোনো দেবদেবীর প্রতি তেদাভেদ না থাকায় ধর্মজগতে দক্ষিণেশ্বর রঞ্জমঞ্জের তিনিই ছিলেন প্রধান নায়িকা। ১২৫৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন বিশ্বেশ্বর ও অঘূর্ণী দর্শনের জন্য কাশীযাত্রার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন তখন যাত্রার ঠিক আগের দিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেবীর কাছ থেকে আদেশ পান, সেই যাত্রা স্থগিত করে গঙ্গা তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও অঘূর্ণেগ দেওয়ার। অতঃপর তিনি জগৎমাতার মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মা ভবতারিনীর মূর্তি স্থাপনের কাজে ব্রতী হন। মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণেশ্বরে যে জমি তিনি কিনেছিলেন তা মন্দির স্থাপনের ক্ষেত্রে একেবারে আদর্শ ছিল কারণ সেই জায়গার মধ্যে ছিল হিন্দুদের শাশান, মুসলিমদের কবরখানা ও গাজী পীরের স্থান এবং খ্রিস্টানদের কুর্চিবাড়ী। তন্ত্রমতে একপাশান কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার অতিউত্তম জায়গা বলে ধরা হয়। রাণী সর্বদাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর এই স্থান ক্রয়ের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্য করা যায়। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহান আদর্শ থেকেও তাঁর অসাধারণ ঐতিহ্যাবের পরিচয় মেলে। রাণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেখানে এমন একজন মহাসাধক পূজারীকে নিযুক্ত করেছিলেন, যাঁর অভিনব পূজাপদ্ধতি ও সাধনার প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর অমৃতময়বাণী পৃথিবীবাসী শুধু মুক্তি বিশ্বে শোনেনি বরং তাঁর সেই শাশ্বতবাণী চিরকালের মতো মানুষের ক্ষুধিত আত্মার এক মহাসম্পদ হয়ে উঠেছে। এই লোকগুরু ও সাধক শ্রেষ্ঠই হলেন - "শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব" যাঁর সাধনপীঠের জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠার আর এক অন্যতম কারণ বলেই মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বললেই নয়, তা হল, ঠাকুর রামকৃষ্ণ রাণী রাসমণির সম্পর্কে খুব উচ্চধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁকে "মা জগদম্বার অষ্টসবীর একজন" বলে অভিহিত করেছিলেন। রাণীমার প্রতি তাঁর এই বিবেচনা রাণীমার মহিমা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল মানুষের মনে।

জনহিতকর কাজ রাণী যেমন নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন তেমনি উৎসব ও পূজাপার্বনেও সক্রিয় ভাবে যুক্ত থাকতেন। রাসমণি দেবীর বাড়ীর সমস্ত পূজো ও উৎসবাদির মধ্যে দুর্গাপূজাই বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালিত হতো এবং আজও হয়। পূজোর নৈবেদ্য, নানারকম উপকরণ প্রভৃতিতে তিনি যেমন অর্থব্যয় করতেন তেমনি পূজো উপলক্ষে লোকখাওয়ানো, দান দেওয়া ও সকলের



মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা-পালাগানের আয়োজনও তিনি করতেন। রানীর বাড়ীর পূজোর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল পূজোর একপক্ষকাল আগে থেকে অর্থাৎ মহালয়ার দিন থেকে চঙ্গীপাঠের মাধ্যমে দেবীর বোধন। বর্তমানে তা যদিও আর পালিত হয়না, তবে আগের ধারা অনুযায়ী আজও জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পূজো করে প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। মৃৎশিল্পীরা বংশপরম্পরায় এই কাজ করে আসছেন। এছাড়া, রানীমার চার মেয়ের বৎসরের উত্তরাধিকারীদের মতো ঢাকী এবং পূজোর কাজের জন্য লোকও বংশপরম্পরায় এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রানী নিজে বৈষ্ণব ভাবাপন্নও হলেও তাঁর শুণুরবাড়ী শাক্তমতে বিশ্বাসী ছিল। তাই দুর্গাপূজোয় অষ্টমীতে পাঁঠাবলি প্রচলিত ছিল। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এই প্রথা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে বাড়ীর পূজোতেও তা বিলুপ্ত হয়েছে। দেবীকে তাই পূজোর ভোগ হিসাবে অন্নভোগের পরিবর্তে লুটি ও বিভিন্ন ধরণের ফল এবং মিষ্ঠি নিবেদন করা হয়। সন্ধিপূজোর সময় অভিনব পদ্ধতিতে অতি আড়ম্বরের সাথে আজও নৈবেদ্য সাজানো হয়। ১০৮ টি প্রদীপ জ্বলে এবং ১০৮ টি পদ্ম, জবা, অপরাজিতা ও বেলপাতার মালা দেবীকে অর্পণ করা হয়। সন্ধিপূজো শুরু হওয়ার প্রারম্ভে ঠাকুরদালানের সামনের উঠান জলে ধূয়ে দেওয়া হয়। সদর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বিশেষ করে পূজোর এই সময়কালে বাড়ীর পুরুষদের ঠাকুরদালানে ওঠা নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিয়ম রানীমার সময় থেকে আজও পালিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে খুব উল্লেখযোগ্য যে রানীমার অনুরোধে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর বাড়ির নাটমন্দিরে এসে দুর্গাপ্রতিমার আরতি করেছিলেন। এটি রানীর কাছে যেমন পরম পাওনা ছিল তেমনি তাঁর পরিবারের পক্ষে ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। আজও নবমীর দিন মহা সমারোহে কুমারী পূজো ও হোম (যজ্ঞ) করা হয়। সময়ের সাথে সাথে পূজোর আড়ম্বর অনেক কমে গেছে ঠিক কিন্তু পরিবারের সদস্যরা ভক্তি ও নির্ভার সাথে সেই পূজো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দশমীর দিন দর্পন বিসর্জনের পর দেবীকে ভক্তি ও মেহ ভরে রীতি মেনে বরণ করা হয়। তারপর কনকাঞ্জলির (মেয়েকে বাপের বাড়ি থেকে শুণুর বাড়ী পাঠানো প্রতীকী রূপে) নিয়ম পালন করে বিদায়ের ব্যবস্থা শুরু হয়। আজও রানীমার বাড়ীর প্রতিমা ৭-৯ বাহনযোগে কাঁধে করে (পাঞ্চ প্রতীকীরূপে কন্যা বিদায়) বাবুঘাটে নিয়ে গিয়ে ৭পাক পরিক্রমা করিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পর দেবীর বেদি বাড়ীর সদস্যরা প্রদক্ষিণ করেন ও কলা পাতায় "শ্রী শ্রী দুর্গা মাতা সহায়" কথিত কলম দিয়ে আলতার সাহায্যে লিখে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তারপর পুরোহিতরা মন্ত্রযোগে শান্তিজল ছড়িয়ে বিজয়ার পর্ব শুরু করেন।

বহুবছর হল রানীমা ইহলোক ত্যাগ করেছেন কিন্তু তাঁর কালজয়ী কীর্তিসমূহ আজও ঠিক একই ভাবে অম্বান হয়ে আছে। তাঁর তেজস্বীতা, প্রজাহিতেষণা, উদারতা, ধর্মানুশীলতা এবং দানের কাহিনীতে তিনি আজও প্রাতঃস্মরণীয়। তাই শুধু আজ নয় অনাগতকালের মানুষও এই পুণ্যশ্লোকা "লোকমাতার" কথা শ্রদ্ধাবন্ত চিত্তেই স্মরণ করবে।

(লেখিকা: শ্রদ্ধেয়া দীপাস্থিতা চৌধুরী, রানী রাসমণির ঘষ্ট পিঁড়ির বংশধরের পুত্রবধু)





## বাস্তুশাস্ত্রঃ সনাতন স্থাপত্য বিদ্যা গৌতম সাহা

দিনের পর দিন আপনি অমানুষিক পরিশ্রম করছেন কিন্তু সংসারের কোন আর্থিক উন্নতি হচ্ছে না, পরিবারের সদস্যদের একের পর এক রোগ বালাই লেগেই আছে, সহ-ধর্মীয় সাথে মনমালিন্য চলছেই, সন্তান সন্তানাদি সব দিনে দিনে উচ্ছমে যাচ্ছে... শত চেষ্টা করেও এসবের কিছুই ঠিক করতে পারছেন না, প্রচণ্ড মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। তাই উপায়ন্তর না দেখে প্রতিবেশী বা বন্ধুর বুদ্ধিতে গেলেন বড় কোন আধ্যাত্মিক বাবা অথবা কোন বড় জ্যোতিষীর কাছে। সে সব শুনে বললেন ‘তোমার বাড়িতে শনির দৃষ্টি পড়েছে, এই দৃষ্টি কাটাতে হলে পরিবার এর সবাইকে বিশেষ দামী পাথর হাতে ধারণ করতে হবে, তবেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে’ অথবা বললেন ‘তোমার বাড়ির চারপাশে বন্ধনী দিতে হবে, তার জন্য অনেক টাকা খরচ হবে’। বাবার কথা মতো এর সব কিছুই করলেন কিন্তু তার পরেও এসব থেকে মুক্তি মিলছেন।

এসব কিছুরই দরকার হতো না যদি আপনি সনাতন ধর্মকে ভালো ভাবে জানতেন ও এর ‘বাস্তুশাস্ত্র’ মেনে আপনি আপনার বাড়ি বানাতেন। হ্যাঁ, ‘বাস্তুশাস্ত্র’, বাস্তুশাস্ত্র হচ্ছে সনাতন ধর্মের অতি পূর্বান্ত এক গৃহ নির্মাণ কৌশল যেখানে কিভাবে বাড়ি বানালে পরিবার এ সুখ শান্তি বজায় থাকবে সে ব্যাপারে বিস্তৃত নির্দেশনা দেওয়া আছে।

‘বাস্তুশাস্ত্র’ শব্দটির ‘বাস্ত’ কথাটা এসেছে সংস্কৃতি শব্দ ‘বস্ত’ থেকে। ‘বস্ত’ অর্থ ‘ভূ’ অর্থাৎ পৃথিবী। তাই পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হওয়া সব কিছুই হলো বাস্ত, আর এই সৃষ্টিকে ঘিরে যে শাস্ত্র তাকেই বলে বাস্তুশাস্ত্র। বাস্তুশাস্ত্র হলো সনাতন ধর্মের এক স্থাপত্য বিদ্যা যেখানে ধর্মীয় মতে গৃহ নির্মাণের সকল কৌশল বর্ণনা করা আছে।

বাস্তুশাস্ত্র হিন্দু ধর্মের এক অতি প্রাচীন স্থাপত্য বিষয়ক ফলিত ও কারিগরি বিদ্যা যা থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বানানো বা সাজানো যে কোন স্থাপনা এনে দিতে পারে সুস্থান্য, সুখ ও শুভফল। সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্যতম মূল ধর্মীয় প্রস্তুত অর্থব্দ বেদ এর একটি অংশ হলো ‘স্থাপত্য বিদ্যা’। অর্থব্দে এর এই অংশ থেকেই বাস্তুশাস্ত্র এর অবতারণা যা প্রায় পাঁচ হাজার বছর প্রাচীন। প্রাচীন কালে হিন্দু মন্দির ও ধর্মীয় স্থাপনা গুলো এই শাস্ত্র মেনে নির্মিত হতো তবে বিশাল প্রেক্ষাপটে তা বসবাসের গৃহ নির্মাণেও ব্যবহৃত হতো। প্রাচীন স্থাপত্য খনিমিরা কেবল রাজমিস্ত্রির ভূমিকাই পালন করতেন না, নির্মাণশৈলী ও পরিকল্পনার বিষয়টিও তাদের তদারক করতে হতো। তাই প্রাচীন স্থাপত্য খনিদের মাঝেই মূলত এই শাস্ত্র এর চর্চা বেশী হতো। তবে তাদের শিষ্যদের এই শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সংশোধনের অধিকার ছিল। যথার্থ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অত্যন্ত গভীর পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে সর্ব-সম্মতিক্রমে এর সংশোধন করা হতো।

গৌরাণিক কাহিনীতে কথিত আছে যে, একবার দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধের সময় দেবতারা অসুরদের সাথে যুদ্ধে পেরে উঠেছিলেন না। তখন সকল দেবতা একসাথে তাদের নিজ নিজ তেজ থেকে সৃষ্টি করলেন এক দেবতা, যার নাম ছিল বাস্তুদেব। এই বাস্তুদেব দেবতাদের কল্যাণার্থে সকল অসুরদের বিনাশ করে তাদের খেয়ে ফেলতে থাকেন। সকল অসুর খেয়ে ফেললেও তার খিদে মিটে না। তাই শেষে উপায় না দেখে দেবতারা এই বাস্তুদেব এর শরীর এর বিভিন্ন অংশে অবস্থান নেন এবং এতে বাস্তুদেবের খিদে নিবৃত্ত হয় এবং তারপর বাস্তুদেব এই পৃথিবী কে ধারন করেন।

শাস্ত্র মতে এই পৃথিবী পঞ্চ ভূ-তত্ত্ব দ্বারা গঠিত- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অর্থাৎ ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। মানব দেহও এই পঞ্চভূতেই সৃষ্টি। তাই একই ভাবে পৃথিবীর বুকে যেকোনো সৃষ্টি বা নির্মাণ এই পঞ্চ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়। অতএব, পৃথিবী, মানুষ ও পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি যেকোনো কিছুর জন্যই এই পঞ্চ তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তার নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা এই পঞ্চ ভূ-তত্ত্বের রহস্য জেনেছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই এরা একে অন্যের সাথে সামঞ্জস্যে থাকে। কিন্তু এই পঞ্চ ভূ-তত্ত্বের অন্তঃসম্বন্ধ কে পরিবর্তন করে তাকে সামঞ্জস্যে রাখা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। যদি এই পঞ্চ ভূ-তত্ত্ব এর ভারসাম্য কে বিনষ্ট করা হয় তবে বিপদ অনিবার্য। তাই পৃথিবীর বুকে যেকোনো নির্মাণ এই পঞ্চভূতাত্মক ব্যবস্থা কে ব্যাহত না করে করতে হবে। কিভাবে এই পঞ্চভূতাত্মক ব্যবস্থা কে বিনষ্ট না করে আমরা আমাদের বস্তবাড়ি বা কর্মসূল নির্মাণ করা হয় তবে সেখানের বাসিন্দা বা কর্মীদের মাঝে সু-সম্পর্ক বিরাজ করে ও জীবন হয়



সুখময়।

সনাতন ধর্মের প্রাচীন মূলি খ্যাতিমান হলেন এই বাস্তুশাস্ত্র এর জনক। তাদের সাধনা, অতীন্দ্রিয় কল্পনাশক্তি এবং অন্তর্দর্শন এর ফসল হলো এই বাস্তুশাস্ত্র। তাই বলাই বাহুল্য যে মানব সমাজ ও স্থাপত্যের উপরে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডের মহাজাগতিক বিভিন্ন শক্তিৰ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্ৰভাব তাদের অজানা ছিল না। স্বীয় সাধনার শক্তিতে নিখিল বিশ্বের এই রহস্যময় বিভিন্ন শক্তিগুলিৰ সম্যক অভিজ্ঞতা তাঁৰা অৰ্জন কৰেছিলেন। তাই তাঁৰা এই রহস্যময় শক্তিগুলি দ্বাৰা মানব সমাজ ও স্থাপত্যের উপর যাতে কোন ক্ষতিসাধন না হয় তাৰ জন্য বাস্তুশাস্ত্রে বিশদ দিক নিৰ্দেশনা দিয়েছেন। আৱ একারণেই বাস্তুশাস্ত্র এৱে নিয়মগুলো সম্পূর্ণ এক বৈজ্ঞানিক ভাবনা। কাৱণ আধুনিক বিজ্ঞানে বৰ্ণনাকৃত সূৰ্যৱশিষ্ঠ, চৌম্বক ক্ষেত্ৰ, বাতাসেৰ গতি ও তাৰ উপৰ পৃথিবীৰ প্ৰভাব সহ এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোৱে উপৰে বাস্তুশাস্ত্র এ আগে থেকেই সম্পূর্ণভাৱে নজৰ দেওয়া হয়েছে।

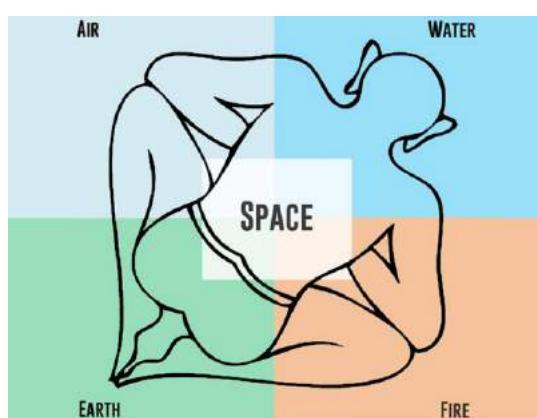
আধুনিক কালে বসত বাড়িৰ জমি যেন সোনার হৰিণ তাই সেই দিক বিবেচনা কৰে বাস্তুশাস্ত্রে ছোট থেকে বড় সব আয়তনেৰ বাড়ি নিৰ্মাণেৰ দিক নিৰ্দেশনা দেওয়া আছে। এছাড়াও এ যুগেৰ প্ৰয়োজন এৱে কথা মাথায় রেখে আদৰ্শ বাড়িৰ জন্য বিভিন্ন অনুকূল দিক ও অন্যান্য পৱামৰ্শ এই শাস্ত্ৰে বলা হয়েছে। পৱিষ্ঠিতি ও প্ৰয়োজন অনুসাৰে এই সব দিকনিৰ্দেশনা সমূহ অনুসৰণ কৰলে পৱিবাৰে শান্তি বজায় রাখা যায়।

কথায় আছে ‘মনেৰ বাস যেখানে, বাড়িতো আসলে সেখানেই’... কথাটা আসলেই সত্য। পৱিবাৰ পৱিজন নিয়ে মনেৰ আনন্দে যে চার দেওয়াল এৱে মধ্যে থাকা হয় সেটাই তো আসল বাড়ি। আমাৱা সবাই চাই সুখে শান্তিতে থাকতে। সুখে শান্তিতে থাকতে হলে এই চার দেওয়াল কে অটুট আমাদেৱকেই রাখতে হৰে। ভালো জমি, দামী সিমেন্ট, রড দিয়ে হয়তো মজবুত চার দেওয়াল বানানো যায় কিন্তু সেই চার দেওয়াল এৱে মধ্যে সুখ শান্তি আনা যায়না। সুখ শান্তি আনতে হলে এসবেৰ সাথে ধৰ্মীয় রীতি ও বাস্তুশাস্ত্র মানা দৱকাৱ।

আমাদেৱ ছেলে মেয়েদেৱ আমৱা বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য বিজ্ঞানে পড়াই। তাৱা সেখানে বাড়ি বানানোৰ আধুনিক বিজ্ঞানেৰ সমস্ত নিয়ম কানুন শেখে। তাঁৰা শেখে কিভাৱে প্ৰকৃতিৰ ভাৱসাম্য বিনষ্ট না কৰে আধুনিক অট্টালিকা বানানো যায়। কিন্তু আমৱা যদি বাস্তুশাস্ত্র পড়ি তবে দেখতে পাৰো পাঁচ হাজাৰ বছৰ আগেই খ্যাতিৰা এৱে সব কিছুই সেখানে আগে থেকেই বৰ্ণনা কৰে গিয়েছেন। সনাতন ধৰ্ম যে একটা পৱিপূৰ্ণ ও সদা-আধুনিক ধৰ্ম তা এটা থেকেই বোৰা যায়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান শুধু মজবুত বাড়িই বানিয়ে দিতে পাৱে কিন্তু বাস্তুশাস্ত্র এনে দিতে পাৱে সেই মজবুত বাড়িতে সুখ-শান্তি।

তথ্যসূত্ৰঃ

All You Wanted To Know About Vastushastra -Kumar, Bijaya, 2000  
ISBN: 978-81-207-2199-9





## ‘আনন্দ করে নাও, দু’দিন বই তো নয়’ প্রিয়রঙ্গন ভকত

বাঙালীদের ১২ মাসে, ১৩ পার্বণ হল দৈনন্দিন কর্মসিক্ত জীবনের থেকে সামান্য বিরতি। ইংরেজি তে একটা কথা আছে ‘Laughter is the best medicine’, যা বাঙালীদের কাছে সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করাটাই বেঁচে থাকার রসদ।

দোরগোড়ায় শারদীয় ১৪-২৪ উপস্থিতি। ষষ্ঠকহোম সার্বজনীন পূজা কমিটির এটি ৫ম প্রয়াস। আগের বছরগুলির মত উদ্যোগ ও আয়োজন এর ব্যাপক প্রচেষ্টা। এবং এই প্রচেষ্টা বাংলার পূজা কমিটি গুলির মতই বহু মাস আগে থেকেই শুরু হয়। যার নিট ফল আজকের এই তিনটি (২৮-৩০ সেপ্টেম্বর) দিন। উপরি পাওনা হিসেবে সপ্তাহান্তের একটি দিন পূজা তিথির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায়।

গত বৎসরের পূজা ১৩-১৫ অক্টোবর ২০১৬ ইয়ারফাল্লা জিমনাসিয়ামে বহু জনসমাগমে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে পালিত হয়। তিন দিন ব্যাপী পূজার ২ দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। গত ১৪ অক্টোবর ২০১৬ ভারত থেকে আগত শ্রীমতী জ্যোৎস্না শৌরির পরিচালনায় নৃত্যগোষ্ঠীর পুরাণের দুই নারী সীতা ও দ্রোপদীর উপর আলেখ্য সকলকে অভিভূত করে। এছাড়াও স্থানীয় শিল্পীদের উপস্থাপনা সকলকে আনন্দ দান করে। তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবে আবালবৃন্দ বনিতার উপস্থিতি আয়োজনকে পূর্ণতা দান করে এবং উপস্থিত সকলকে প্রসাদ ও দ্বিপ্রাহরিক ও নৈশ ভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

নতুন পূজাপ্রাঙ্গণের আয়তন বড় হওয়ায় আয়োজক ও দর্শনার্থীদের সুবিধা হয়েছে। সুবিশাল সভাগৃহ ও খাবার পরিবেশনের পরিসর ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় বসার ব্যবস্থা, ছেট ছেট আলাপচারিতা ও প্রশাসনিক পরিচালনায় জায়গা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন এর সুবিধাদান করেছে।

দুর্গাপূজার আশাতীত ভিড়কে মাথায় রেখে একই প্রাঙ্গণে শ্রী শ্রী কালী পূজা ও ২০১৭-র শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা আয়োজিত হয়। উভয় পূজা দুটিই দর্শক সমাগমে যথেষ্ট আনন্দ ও উন্দীপনার সাথে পালিত হয়। দুটো ব্যাপার আয়োজকদের চিন্তার কারণঃ ১। প্রাঙ্গণের ভৌগোলিক অবস্থান ও পৌঁছানোর (অ)সুবিধা, ২। আর্থিক দায়ভার।

পূর্ববর্তী পূজা প্রাঙ্গণের তুলনায় ভাড়ার অতিরিক্ত আয়োজকদের নতুন আর্থিক সাহায্যকারীর সন্ধান করতে হচ্ছে। এই ব্যাপারে যে কোন সহদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সাহায্যের হাত বাড়ালে সংগঠনের এই বিশাল আয়োজন সুন্দর ভাবে করা যেতে পারে। সংগঠনটি গত ২০১৫ সালে Skatleverket দ্বারা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান (Ideela Förening kultur) হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। প্রতি বৎসর আইন অনুযায়ী হিসেব পেশ করা হয়।

বর্তমান পূজা সংখ্যাটি ৫ বছরে পার্দিল। বিদেশে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এইরূপ পূজা সংখ্যা খুব বেশী দেখা যায় না, যা সকলের দ্রষ্টি আকর্ষণ করেছে। ষষ্ঠকহোমস্থিত ভারতীয় দৃতাবাস এই প্রয়াস কে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে। আপনাদেরকেও লেখা ও বিজ্ঞাপন দিয়ে এটিকে সমন্ব করার সর্বিনয় অনুরোধ রইল।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও আয়ের একটি সামান্য অংশ Aspire and Glee নামক বেসরকারি সংগঠনের মাধ্যমে কলকাতার বস্তী এলাকার বাচ্চাদের নতুন সুন্দরতর সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে ব্যয় হয়েছে।

পূজানুষ্ঠানের সাথে সাথে সুইডেনে বসবাসকারী ভারতীয়/বাংলাদেশের জনসংখ্যার দিকটি দেখা যেতে পারে যা আমাদের আয়োজনের দিকে দ্রষ্টিপাত করতে পারে। ১৭০০ সালে সুইডেন এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ (২ মিলিয়ন), ২০১৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) একটু বেশী। ২০১৫ সালে দেখা গিয়েছে মহিলাদের গড় আয় যেখানে ৮৪ বছর সেখানে পুরুষদের ৮০,৪ বছর। SCB র সর্বশেষ পরিসংখ্যান (৩০৩ নভেম্বর ২০১৬) অনুযায়ী ২০১৫ সালে ৫৫০০ সুইডিশ নাগরিক এদেশ ছেড়ে চলে গেছে এবং একই সময়ে এসেছে ১৩৪২৪০ জন। আগত মানুষদের সর্বোচ্চ যুদ্ধবিধবস্ত সিরিয়া থেকে, ভারতের স্থান ঘষ্ট এবং বাংলাদেশ এর স্থান প্রথম ২০টি মধ্যেও নেই। একক ভাবে ২০১৬-এর সংখ্যা ধরলে বাংলাদেশ এর নাগরিক থেকে সুইডিশ নাগরিকে রূপান্তরিত হওয়ার



সংখ্যা ৬১১। আবার একইভাবে এই দেশ ত্যাগ করার সংখ্যাটা ১৭০। একই সময়ে ভারতীয় থেকে সুইডিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করার সংখ্যা ৪২৪৭। উল্লেখিকে নাগরিকত্ব হেড়ে দেওয়ার সংখ্যা ১৭৩৮।

এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো ১৯৭৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার সংখ্যা ৫৭৫৬৫ জন। একই সময়ে ১৪০৭৩১ জন ভারতীয় সুইডিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও স্বল্প মেয়াদী কাজে ও পড়াশোনার জন্য বেশ কিছু মানুষ এই দুটি দেশ থেকে এদেশে যাতায়াত করেন। সংখ্যাবিচারে আনুমানিক ২০০০০০ মানুষ আমাদের সাংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে কমবেশী পরিচিত। এই জনগোষ্ঠীর স্বল্পাংশ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, যা সংখ্যার নিরিখে খুব একটা কম নয়। মনে রাখা ভালো এই সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান, আগামী শারদীয় উৎসব আয়োজন এর আগে আমাদের এই সংখ্যাটা মনে রাখা দরকার। মঙ্গলময়ী মা'র চরণে আপনাদের সুস্থ, সুবল ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।

‘যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।  
নমস্ত্বে নমস্ত্বে নমস্ত্বে নমঃ নমঃ ॥’





## মানবতার জয় হোক

### রামেন্দু মজুমদার

‘শরতে আজ কোন অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে ।  
আনন্দ গান গা রে হৃদয়, আনন্দ গান গা রে।।’

বাংলার ষড়খ্যাতুর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, রূপ আছে। সে রূপ প্রত্যক্ষ করতে হলে প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আজ নগরায়ন এর ফলে আমরা প্রকৃতির থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। আর যারা বিদেশে থাকেন তাদের কথা তো আলাদা। তবু তারা অনুভব করতে চান বাংলার খতু বৈচিত্রের আমেজ।

রবীন্দ্রনাথের মতো আমাদের হৃদয়ও আনন্দগানে ভরে ওঠে শরতের আগমনে। যদিও গৌঁঞ্জ, বর্ষা বা শীতের মতো শরৎকালকে আমরা তেমন আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারি না, তবু শারদীয় দূর্গোৎসব এলে বাঙালী হিন্দু সম্পদায়ের হৃদয় উদ্বেলিত হয়, পূজার কটা দিন আনন্দ- উৎসবের মধ্যে দিয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে কাটাতে চান।

আমাদের অনেকেরই শৈশব-কৈশোর কেটেছে গ্রামে। স্বাভাবিকভাবেই পূজা এলেই আমরা স্মৃতি কাতরতায় ভুগি। মন চলে যায় সেই সব ফেলে আসা দিনগুলোতে।

বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি, নোয়াখালির থানা লক্ষ্মীপুর (যা এখন জেলা শহর) থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ি দন্তপাড়ার মাণ্ডরী যেতাম পূজার সময়ে, ফিরতাম লক্ষ্মীপুজার পর। আমাদেরকে যেতে হত নৌকা করে, বর্ষাকালে রাস্তা ধরে যাওয়া যেত না। ১৯৪৬ এর দাঙ্গার আগ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের বাড়ির চার হিস্যা (শরিক)-এর চারটা প্রতিমা পূজা হত। দাঙ্গার পর থেকে পরিস্থিতি বদলে যায়, সবাই মিলে তখন একটা প্রতিমা স্থাপন করতেন। সেসব দিনের কথা আমার এখনো মনে আছে। কয়েক বছর পর পূজার সময় গ্রামের বাড়িতে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেলো। লক্ষ্মীপুরের দুটো সার্বজনীন পূজা মণ্ডপেই আমরা শারদীয় দূর্গোৎসবের আনন্দ-উৎসব করতাম।

লক্ষ্মীপুরের সাথে সম্পর্ক ছিল হয়েছে আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী। লক্ষ্মীপুর ছাড়ার পর কেন জানি পূজার আনন্দ আর সেরকম ভাবে অনুভব করিনা। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলোই খুঁজে বেড়াই।

বিদেশে যারা শারদীয় দূর্গোৎসব এর আয়োজন করেন, তাঁরা প্রধানত করেন সবার সাথে মিলবেন বলে। উৎসব মানেই তো মিলন। উৎসব মানেই সকলে মিলে আনন্দ করার একটা উপলক্ষ। দীর্ঘদিন ধরেই খতু বা মাসের সাথে সম্পর্কিত উৎসবের চল রয়েছে আমাদের সমাজে। এ উৎসব এখন আর কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাঙালীর এক বড় সামাজিক উৎসব। আমাদের বিভিন্ন ধর্মের উৎসবগুলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধির এক সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা সকল ভেদাভেদে ভুলে একে অন্যের সাথে মিলব, উৎসবের দিনগুলো আনন্দে কাটাব।

অসাম্প্রদায়িক বাঙালী সংস্কৃতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাটুল সম্মাট শাহ আবুল করিমের সেই বিখ্যাত গান ‘আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম’ - এর মধ্যে কি চমৎকার ভাবে বিধৃত হয়েছে আমাদের সেই সোনালী অতীতের কথা। কিন্তু ক্ষেত্রে আমাদের হৃদয় রক্তক্ষেত্র হয় যখন দেখি ধর্মান্ধ জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী সকল শুভ অর্জনকে ধ্বংস করার জন্যে আজ তাদের সকল শক্তি নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর হীন রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের মদত যোগাচ্ছে কিছু রাজনৈতিক দল। আমাদের সামনে এখন মোটা দাগের প্রশংসন, আমরা কি আলোর পথে যাত্রা অব্যাহত রাখব না আদিম অন্ধকার যুগে ফিরে যাব ? আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অন্ধকারের শক্তি কখনো আমাদের গ্রাস করতে পারবে না।

বাংলাদেশ এখন নানা জায়গায় জাঁকজমক এর সাথে সার্বজনীন দূর্গোৎসব এর আয়োজন করা হয়। প্রতিমা দর্শনার্থীদের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রচুর লোক থাকেন। এটা একটা ভালো দিক। উৎসবের আনন্দ সবার সাথে ভাগভাগি করে নিলে তা অনেক বেড়ে যায়। বাঙালী উৎসবের মধ্যে তার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে।

দেবী দূর্গা অসুর বিনাশ করেছেন। তাই এবারের শারদীয় দূর্গোৎসবের প্রাক্তৃতে আমাদের প্রার্থনা সকল অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটবে, শুভ বৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জয় হবে, মানবতার জয় হবে। পৃথিবী জুড়ে মানবতা বিরোধী অসুরদের যে আস্ফালন শুরু হয়েছে, তার অবসান ঘটুক।

ষটকহোল্য সর্বজনীন পূজার সাথে জড়িত সবার মঙ্গল কামনা করি।



## আমাৰ ফিৱে দেখা

### স্বপন চট্টোপ্যাধায়

আবারো ফিৱে আসা আমাৰ এই দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল, আমাৰ পরিবাৱেৰ ছত্ৰছায়ায়, এই সুইডেন-এ। আমৰা যারা নিজেদেৱ প্ৰবাসী বলে অভিহিত কৰি তাদেৱ শেকড়টা যে কোনখানে শক্ত মাটি পেয়েছে তা এক প্ৰশংসনোদ্ধক চিহ্ন হয়েই আমাৰ মনে দোলা লাগায়।

তাই বাবাৰ ফিৱে যাই গাছেৱ শেকড়টা যেখানে প্ৰথম মাটি পেয়েছিলো তাৱই উদ্দেশ্যে, প্ৰতিবাৱেই বেশ কিছুটা হতাশ হই আৱ দেখি গাছটাৰ কয়েকটা শুখনো ডাল-ই পড়ে আছে শেকড়টা কৰেই কে যেন উপড়ে ফেলে মাটিৰ সেই কোমলতাৰ ওপৰ ইঞ্চ পাথৱেৰ এক চাতাল বানিয়ে ফেলেছে। মাটি খুড়ে হারিয়ে ফেলা শেকড়টাৰ সুস্থতা খুঁজতে গিয়ে হাত দুটোই ক্ষত বিক্ষত কৰে তুলি, হতাশায় জৰ্জিৱত হই আৱ ভাৱি তবে কি "আমাৰ তাহলে সত্যিই শেকড় ছিঁড়েছে"।

আমাৰ এই দ্বিতীয় আশ্রয়স্থলে নয় কৰেও অনেক বছৰ কাটিয়ে দিলাম। সময়েৱ সাথে সাথে এখানেৱ শেকড়টাৰ এখন যথেষ্টই শক্ত পোক্ত। স্ত্ৰী, ছেলো, মেয়ে দৌহিত্ৰ নিয়ে ঘৰ বেঁধেছি। বৰাৱৰই চেষ্টা ছিল আমাৰ এই নতুন আশ্রয়স্থলকে নিজেৰ কৰে নেওয়াৱ, যদি ও এখনো খাওয়াৱ টেবিলে "টেকুৱ" তুলে ফেলি বা হাঁচলেই "প্ৰসিত" বলাৰ অভ্যেসটা এতোদিনেও কৰে উঠতে পাৰি নি, তবে মনে হয় আমাৰ স্বভাৱবোধেই এই সমাজটাৰ বা এদেশীয় লোকজনেৱ খুব কাছেৱ মানুষই হয়ে ওঠাৰ সুযোগ পেয়েছি।

মা৤ কয়েকদিন আগেই আমাৰ শেকড়স্থল সেই কোলকাতা থেকে এসে দাঁড়ালাম আমাৰ এই ছোট শহৰ কাৰ্লস্টড-এ। এ এক অপাৱ আনন্দ পৰিবাৱ পৱিজনেৱ আৱাৰ কৰে সঙ্গ পাওয়া, দৃষ্টিত বায়ু সেবনেৱ পৱিবৰ্তে নিৰ্মল বায়ু সেবনেৱ দামামা বাজানো, কলকাতাৰ সমালোচনাৰ বড় তোলা এবং সাথে সাথে এই দেশটাৰ যে কত অধঃপতনে এগিয়ে চলেছে তাৱ এক হিসেব কষা। প্ৰশংসন জাগে মনে "আছা আমাদেৱ কি কোনোদিন কোথাও সত্য শেকড় গজিয়েছিলো না আমৰা যারা গাছেৱ এবং তলাৰ ফল কুড়োতেই ব্যস্ত তাৱ বৰাৱৰই এক আগাছা, তাৱ উৎপাটিত হওয়াৰ জন্যই জন্মেছিলাম" ?

এবাৱ আমাৰ উত্তৰ কোলকাতা (নেটিভদেৱ আদি কোলকাতাৰ গোড়াপত্ন) এবং সাৰ্বিকভাৱে কোলকাতা দৰ্শনেৱ অভিপ্ৰায়ে যাওয়া। সেই বাগবাজাৰ ঘাট, কুমাৰটুলি ঘাট, কাশিমতিৱেৱ ঘাট, আউট্ৰামঘাট, গঙ্গাৰ ধাৰ ঘেঁষা আৱো কত ঘাট এখনো সাক্ষী দিয়ে চলেছে সেই বাংলাৰ জমিদাৰদেৱ আৱ "বাবু কালচাৰ"-এৱ রমৱমাৱ।

সংক্ষাৱ এৱ অভাৱে ঘাটগুলিৰ অবস্থা শোচনীয়, তথেবচ অবস্থা জমিদাৰবাড়িগুলিৰ। রাজা নবকৃষ্ণৰ বাড়ি তাৱ এক ভাঙা আভিজাত্য নিয়ে এখনো এক পায়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। রাজা রাজেন্দ্ৰ মল্লিকেৱ "মাৰ্বেল প্যালেস" এখনো এক রাজেন্দ্ৰনী-ৰ মতো একটা ঘিঞ্জি গলিতে শোভা পাচ্ছে। যারা এখনো বাড়িটিকে দেখাৰ সুযোগ পাননি তাৱ পৱেৱ বাৱ কলকাতা গেলে অবশ্যই দেখে নেবেন।

মহৰি দেবেন্দ্ৰ নাথেৱ ঠাকুৱ বাড়িটিৰ কাঠামো এখনো ঢিকে আছে তাৱ সন্তুত কাৱণ রবীন্দ্ৰনাথ ওই বাড়িতেই জন্মেছিলেন এবং ওনাৰ পাৱলোকগমনও ওই বাড়িটিতেই হয়েছিল। আজ বাড়িটি বৰীন্দ্ৰভাৱতী বিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত। বাড়িটিতে ঠাকুৱ পৱিবাৱেৱ একটি সংগ্ৰহশালাৰ আছে। আমাৰ এবাৱও কোলকাতাকে পুৱোপুৱি না দেখেই ফিৱতে হলো, কাৱণ ইনফৰমেশন-এৱ অভাৱ, কোথায় বা ছিল শিৱিশ ঘোষেৱ বাড়ি, কোথায় বা ছিল দন্ত-দেৱ (মধুসূদন দন্ত) বাড়ি, কোথায় বা শৱচতুৰ্দশ বা বিদ্যাসাগৰ মহাশয় থাকতেন সে খবৰ যাকেই জিজ্ঞাসা কৰি সেই কেমন অসহায়েৱ মতো তাৰিয়ে থাকে। তবে ইচ্ছে রইলো পৱেৱ বাৱ আৱো অনুসন্ধিৎসু হয়ে খোঁজাখুঁজি কৰাৱ।

এবাৱ আসি মধ্য কোলকাতায় অৰ্থাৎ সাহেবদেৱ পাড়ায়, যেখানে "Hogg" সাহেব মাৰ্কেট বানিয়েছিলেন রানী ভিট্টোৱিয়াৰ পাঠানো সাহেব কৰ্মচাৰীদেৱ জন্য, যা নাকি আজ "নিউ মাৰ্কেট" নামে পৱিচিত।

জায়গাটিৰ এখন "হকাৰ্স কৰ্নাৰ" নাম দিলৈই বোধহয় ঠিক শোনাবে এবং মানাবেও নেটিভ কালচাৱেৱ সাথে তাল মিলিয়ে। ছোট বেলায় (স্বাধীন দেশেৱ স্বাধীন নাগৰিক ) শুনতাম নিউমাৰ্কেট-এ নাকি পয়সা ফেললে বাঘেৱ দুধও পাওয়া যায়। জানিনা, ওই কথাৰ মাধ্যমে বোৰানো হতো হয়তোৱা Hogg সাহেবেৱ মাৰ্কেট-এৱ আভিজাত্যেৱ কথা।। হয়তো বা তাই, কিন্তু আজ যদি Hogg সাহেব বেঁচে থাকতেন তাহলে নিৰ্ধাত তিনি আত্মহত্যাৰ পথ বেছে নিতেন বলেই আমাৰ মনে হয়।

ইংৰেজ আমলে ওনাৰা চেষ্টা কৰেছিলেন কোলকাতাকে লক্ষণ শহৱেৱ এক প্ৰতিক্রিপ্তি দেওয়াৱ। দিয়েছিলেনও, তাৱ অনেক নজিৱ ছড়িয়ে আছে মধ্য কোলকাতাৰ আনাচে কানাচে। চওড়া রাজপথেৱ ধাৰে ধাৰে গথিক স্টাইল-এৱ বড় বড় ম্যানসন-এৱ বেশ কিছু ভগ্নাবশেষ এখনো ব্ৰিটিশ রাজ -কে পাশ কাটিয়ে যেতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।



রাজপথ ধরে কিছুটা এগোলেই জাতীয় সাংগ্রহশালা আর একটু এগোলেই ইংরেজদের বিনোদন পাড়া সেই "পার্কস্ট্রিট" আমাদের পরিবারের কাছে এই পাড়াটি অনেকটাই নিষিদ্ধ পাড়া বলেই গণ্য হতো কারণ এখানেই ছিল Night Clubs, Pubs, Casinos এবং আরো অনেক রকমের বিনোদনের ব্যবস্থা। ইংরেজ আমলে নেটিভদের এই মধ্য কোলকাতার সাহেবদের পাড়ায় যাওয়া আইনানুযায়ী একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল, তাই ওই পাড়াসমূহকে তাদের ধারণাও খুব একটা কিছু ছিল না। তবে আজ "স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক" হিসেবে সেই নেটিভদের দৌরাত্মৈ এই পাড়ায় সবচেয়ে বেশি। এই পার্কস্ট্রিটের আলোকসজ্জা এক দ্রষ্টব্য বিনোদন হয়ে দাঁড়ায় সকল কোলকাতাবাসীর কাছে বিশেষ উপলক্ষ যেমন যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন পালনে।

সামনেই ময়দান, ঘিরে লালদিঘি (রাজকর্মচারীদের জন্য পানিও জালের ব্যবস্থা) ফুটবল প্লাউড, টেনিসগ্রাউন্ড, রেস কোর্স (রাজ্য রাজাদের খেলাধুলোর ব্যবস্থা)। পায়ে চলা গতির মধ্যেই অফিস পাড়া (ডালহৌসি ক্ষেত্র), তখনকার কিছু স্থাপত্য আজ ভবস্থুরের আস্তানার সাথে ইঁতুর আরশোলার এক অরন্ধন। সাহেবেরা তাদের বিনোদনের জন্য অনেক সিনেমা এবং থিয়েটার হল বানিয়েছিলেন যেমন METRO, GLOBE, NEW EMPIRE ইত্যাদি, যার আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই, সবই এখন Mall Culture-এর শিকার হয়েছে। METRO সিনেমাহলটি এখনো আছে বটে, কিন্তু তার দুরবস্থা ছবি থেকেই বোৰা যায়।।

আমাদের কৈশোরে এবং যৌবনে আমরা ওই তথাকথিত হলগুলিতে ইংরেজি ছবি দেখতে যেতাম কারণ একমাত্র ঐসব হলেই ইংরেজি ছবির আসা যাওয়া ছিল। আজ সবই স্মৃতি, আজ বলিউড আর টলিউডের বাজার, শুনেছি এখন বিদেশী ছবি দেখার সৌভাগ্য নাকি ফিল্মফেষ্টিভালগুলো দিয়ে থাকে। আজ আবার ইন্টারনেট-এর রমরমা তাই বিভিন্ন বিদেশী ছবি আজ ইচ্ছে থাকলে ঘরে বসেই দেখা সন্তুষ, তাই আমাদের সময়ের বিনোদনের মাধ্যম সিনেমা হলগুলি তাদের আকর্ষণ হারিয়েছে। শপিংমলগুলিতে অনেকগুলি হলের সমষ্টি নিয়ে মাল্টিপ্লেক্স-এর নরম গদিতে গা এলিয়ে বসে ছারপোকাদের কামড় বাঁচিয়ে আজ ছবি দেখতে যাওয়া এক অনিন্দিত বিনোদনের অংশ হলেও সেটি এক বিশেষ শ্রেণীর ক্ষমতার মধ্যেই পড়ে বলেই আমার মনে হয়।

সাধারণ নাগরিকের বিনোদন আজ আর মাল্টিপ্লেক্স নয় সন্তুষ্ট তাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন আর টিভি-র হরেক রকমের পরিবেশনা। বিস্তৃত ময়দান-এর আশে পাশে ছড়ানো ছিল ব্রিটিশরাজের এক অপূর্ব শিল্পসৃষ্টি বেশ কয়েকটি ভাস্কর্য। যার জায়গায় স্থান নিয়েছে আমাদের জাতীয় নেতারা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদারদের অবয়ব, কিন্তু তাদের কোনো ভাবে উচ্চস্তরের ভাস্কর্য বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এবারেও আমার বাট্টুলেপনার মধ্যে খুঁজে পেলাম দুটি ইংরেজ সৈনিক-এর প্রতিমূর্তি, যে দুটি কেন যেন এখনো দাঁড়িয়ে আছে প্রভুভূতির নজির স্বরূপ।

কমুনিষ্ট আমলে কোনো একজন কমরেডের ইচ্ছা অনুযায়ী ওই সংগ্রহশালায় রাখার মতো ভাস্কর্যগুলি উপড়ে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু তাদের অবস্থান এখন যে কোথায় তার উত্তর জিজ্ঞাসা করতে যাওয়াটাও বোধহয় দেশদ্রোহীতার সামিল বলেই ধরে নেওয়া হবে। আজকের জাতীয় সংগ্রহশালা, ভিট্টেরিয়ার সৌধ, রাজভবন, রাইটার্স বিল্ডিং, জিপিও বা ডালহৌসি পাড়া সবই কিন্তু সেই ইংরেজ রাজেরই নির্দর্শন বহন করে চলেছে। ইতিহাসকে মুছে ফেলা কি সত্যিই এতো সহজ ছিল? ভাস্কর্যগুলি যদি জাতীয় সংগ্রহশালায় রাখা হতো তাহলেও হয়তো ভাস্কর্য শিল্পীরা সেগুলো দেখা এবং অনুশীলনের সুযোগ পেতেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় দু হাজার বছর পরও আজো আমরা তাদের ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য দেখার জন্য ছুটে বেড়েই তাই নয় কি? তাহলে?

এই বিস্তৃত ময়দানটির একটি অংশে মহারানী ভিট্টেরিয়ার স্মৃতিসৌধ "ভিট্টেরিয়া মেমোরিয়াল"। ইংল্যান্ডের রানী ভিট্টেরিয়ার মৃত্যুর (১৯০১) পর লর্ড কার্জন এই স্মৃতিসৌধটির গোড়াপত্তন করেন ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে। রাজা পঞ্চম জর্জ এর উদ্বোধন করেন ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। এই শ্রেষ্ঠ পাথরের তৈরী সৌধটি আজও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপত্যশৈলীর নির্দর্শন হয়ে এখনো বিদ্যমান। এই সৌধটির মধ্যে সংগ্রহশালাটি এখনও ইংরেজ রাজের আমলের অনেক নথিপত্তরে কোলকাতার ইতিহাসকে বহন করে চলেছে।

দক্ষিণ কলকাতা ছিল ইংরেজ আমলে জঙ্গলে যেরা এবং সেখানে বিরাজ করছেন সেই কিংবদন্তী কালীঘাটের মা কালী। সেইসময় থেকে এই শতাব্দীতেও তাঁর ভক্তের সংখ্যা অনেক, হয়তো বা অনেকটাই বেড়েছে যাতায়াতের সুবিধায়। ইংরেজ রাজ্যের আমলে কথিত আছে হিংস্র জন্ম জানোয়ার এবং ডাকাতদের দৌরাত্ম ছিল ওই এলাকায় তাই ভক্তেরা কালীদর্শনে দল বেঁধে যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনতেন। আজকের আভিজাত্যপূর্ণ দক্ষিণ কোলকাতার বেড়ে ঝোঁঠার কাল অনেক পরের।

গঙ্গার পূর্বদিকে আবহমান গঙ্গা, তার ওপারে ইংরেজদের তৈরী তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি। আর পশ্চিমদিকে ছিল নেটিভদের গ্রামগুলির বিস্তার। কোলকাতার লোকসংখ্যা বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সেই ইংরেজ আমল থেকেই তার পরিবর্তন এসেছে আর আজকের কোলকাতা তার বেশ কিছু হারিয়ে ফেলা স্মৃতি নিয়ে আজ আর এক তিলোত্তমা কোলকাতার রূপ নিয়ে হাজির। এক কথায় কোলকাতা এখনো "Oh Calcutta"-তেই বিরাজমান।





## বৃষ্টিভেজা চৌরঙ্গী পাথওজন্য ঘটক

চৌরঙ্গী, এসপ্লানেড, ধর্মতলা বলতে বোধহয় মোটামুটি একই এলাকা বোবায়। কলকাতার এবং শহরতলীর বেশ কিছু মধ্যবিত্ত বাঙালি এই অঞ্চলে দিনের অনেকটা সময় কাটালেও, রাত্রিবাস সচরাচর করেন না। সন্ধ্যার পর বা রাত খানিকটা গড়ালে তাঁরা মেট্রো, বাস, ট্যাক্সি, উবের, ওলা, লগও এসবের মাধ্যমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব বা পশ্চিমে শহরতলীর দিকে ধীরে ধীরে রওনা হন। যাঁদের নিজেদের গাড়ি আছে তাঁদের তাড়া কম। চৌরঙ্গীতে রঙিন রাত নামে -- মধ্যবিত্ত বাঙালির তাতে বিশেষ ভূমিকা থাকে না। একটু সন্দেহের চোখেই দেখে চৌরঙ্গীর রাত্রিকে বাঙালি।

এবছর জুলাইতে কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ আমার চৌরঙ্গীতে বেশ কয়েকটি রাত আর দিন কাটানোর সুযোগ এসে গেল | আমাদের টালিঙংজের নতুন ফ্ল্যাটেই উঠেছিলাম | স্থানে কাজ চলছে নানারকম | শোয়া বসার মোটামুটি ব্যবহৃত থাকলেও দেখলাম জল একেবারেই বদ্ধ | কলকাতার হাল ফ্যাশনের বহুতল বাড়িতে ভারী দিয়ে জল তোলার চল নেই | স্পেন্সার থেকে ৫ লিটারের কয়েকটি জলের জারিকেন দিয়ে কোনোরকমে রাতটুকু কাটানো গেল | টলি ক্লাব বা ক্যালকাটা ক্লাবে ফোন করে শুনলাম কোনো ঘর ফাঁকা নেই | অথচ কলকাতায় অস্ততঃ দিন তিনেক না থাকলেই নয় | তখনি মাথায় এসে গেল কথাটা -- চৌরঙ্গীতে গিয়ে থাকি না কেন ? দেখিই না, চৌরঙ্গীতে রাত কাটাতে কেমন লাগে ? ফোন করে বুকিং পেয়ে গেলাম Peerless Inn এ | পরদিন সকালে চেক ইন করলাম | ৮ তলার ঘরে ঢুকে দক্ষিণের বিরাট জানালার পর্দা সরিয়ে দিতেই চোখে ভেসে এলো সবুজ ময়দান আর ভিট্টরিয়া মেমোরিয়াল | আর এই ফ্রেমের বাদিক ঘেঁষে ঢ্যাঙ্গা ৪২ | বিশাল উঁচু বাড়িটির খাঁচা দাঁড়িয়ে আছে | একা | মনে হলো না আমাদের চৌরঙ্গীর সঙ্গে কোনোদিন এর ভাব হবে | পাশেই বিখ্যাত গ্র্যান্ড হোটেল | বিশাল ছাদ ছড়িয়ে আছে অযত্নে | বৃষ্টি ভেজা রাস্তায় মানুষ আর গাড়ির চলাচল একটু কম যেন |

| অলস ভঙ্গিতে আড়মোড়া ভাঙ্গে চৌরঙ্গী প্লেস - গ্র্যান্ড আর Peerless inn এর মাঝের রাস্তটি |

মাথার ভেতর তখন পুরোনো কথার ছড়োছড়ি | বৈশালীর নানারকম শপিং এর তাড়া ছিল | কোয়েষ্ট মলে বিরাট পরিকল্পনা | বললাম  
মলের কলকাতার শপিং সেরে সন্ধ্যার ভেতর ফিরে আসতে | ততোক্ষণে আলসেমি করি আর আমার চৌরঙ্গীর স্মৃতির সঙ্গে আড়া দি |  
বৈশালী বেরিয়ে গেলে এক কাপ চা নিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলাম | ভিট্টেরিয়া মেমোরিয়াল আর ময়দান দেখতে দেখতে ঠিক এভাবে  
চা খাওয়া হয়নি এর আগে | বৃষ্টি ভেজা ময়দানকে কি নিরীহ -- কি আদুরে লাগছিলো | মনেই হচ্ছিলো না এই ময়দান কত অভিসার,  
কত লেনদেন, কত মানুষকে পেছন থেকে কুরুরে মতো গুলি খাওয়ার নীরব সাক্ষী | গ্র্যান্ডের ছাদে কাউকে দেখতে পেলাম না |  
আজকাল স্যাটা বোস বা গোমেস সাহেবেরা কি হোটেলের ছাদে ঘোরাফেরা করেন না আর ? হোটেলটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে  
মনে হচ্ছিলো এই বাড়িটির কোনো ঘরে ফুটবল স্মার্ট পেলে রাত কাটিয়ে গেছেন ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে | কত নামি দামি টেস্ট  
ক্রিকেটার খেলার শেষে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়েছেন এই বাড়িটির কত ঘরে | মনে পড়লো সুনীল গাভাক্ষার এর ৭৮ এর ডিসেম্বর এ  
ওয়েষ্ট ইন্ডিজ এর বিরুদ্ধে দুটি ইনিংসে দুটি অনবদ্য সেঞ্চুরির কথা | আবার মনে পড়ে গেল ১৯৮৩ র ডিসেম্বরে মার্শালের প্রথম বলেই  
ওনার আউট হয়ে যাওয়ার কথা | সেই গ্লানির সাক্ষী হয়ে আছে এই হোটেলের কোনো ঘর | এই চৌরঙ্গীর রাস্তা ধরেই ১৯৪৬এ ১৬ই  
অগাস্ট মনুমেন্টের জমায়েত ফেরত মানুষের পথ ধরে জুলে উঠেছিল যে আগুন সেই আগুন কি নিভেছে? পুরোপুরি ? ১৯৭৮ এর বন্যায়  
কলকাতা যখন ভাসছে -- মেট্রো সিনেমায় তখন মানুষের হাতাহাতি -- সত্যম শিবম সুন্দরম ছবির একটি টিকিটের জন্য | এই চৌরঙ্গীর  
রাস্তা দিয়ে বছরের পর বছর কত মিছিল বয়ে গেছে বিগেডের দিকে | কত আশা -- কত আশাভঙ্গ | কত চিংকার করে বলা কথা -- কত না  
বলা কথার সাক্ষী এই চৌরঙ্গী | অলসভাবে চা খেতে খেতে দেখেই যাচ্ছিলাম | চৌরঙ্গীতে সবার বড়ো তাড়া থাকে | জুলাইয়ের সেই  
ক্রিস্টাঙ্গ পুরে আমার কোনো তাড়া ছিল না |

সন্ধ্যা পার করে বৈশালীকে নিয়ে বেরোলাম রাতের টোরঙ্গীর আমেজ নিতে | আমার জীবনের প্রথম অনেক কিছুর নিশান খুঁজে বের করতে | নিউ মার্কেটের পশ্চিম দিকে বাঁক্রাম স্ট্রিট | সার বাঁধা অনেক দোকান | ওরই ভেতর এক সাহেবি পুরোনো কলকাতার গন্ধ মাখা ছেট একটি টেলারিং শপে আমার প্রথম স্যুট তৈরী করানো হয় | ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে | আমার দাদামণির বিয়েতে পরবো বলে | দোকানটা মিক ঘূর্ণ করে উঠতে পারলাম না | নায়টা একদিন পর আব যানে পদচলো না | বষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় যানে হলো জ্যাম্ব বাঁধা



দোকানগুলো একইরকম আছে যেন | খানিক এগিয়ে ডানদিকে ঘিরে চোখে পড়লো নিউ এস্পায়ার সিনেমা | ১৯৮১ তে Superman The Movie বোধহয় প্রথম দেখা সিনেমা এই হলে | ওয়ার্নার ব্রাদার্স এর ছবি নিয়ে আসতো কলকাতার মানুষের জন্য এই হলটি | এখন বলিউডি ছবি দেখিয়ে কোনোরকমে টিকে রয়েছে | পাশের Lighthouse বন্ধ হয়ে গেছে | বন্ধ হয়ে গেছে কি চ্যাপলিন? যেখানে আমার ভাই পার্থসারথিকে নিয়ে প্রথম ইংলিশ সিনেমা দেখেছিলাম দুজনে | আর দারুণ ক্রিম ভরা পেন্টি খেয়েছিলাম দোতলার বেকারি থেকে | ফ্লোর সিনেমাও বন্ধ হয়ে গেছে দেখে আর এগিয়ে দেখার ভরসা হলো না | ফ্লোর সিনেমার কোণাকুণি এক তিনতলা বাড়িতে ছিল British Jeans Centre | আমার প্রথম জিল্প ওই দোকান থেকেই কেনা | বাড়িটি আছে -- তবে মনে হলো না সেই জিসের দোকানটি আর আছে | কলকাতার মলে এখন পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিসাইনার জিল্প আর হরেকরকম জামাকাপড়ের পসরা |

আমার প্রথম সিগারেট খাওয়া লিভসে স্ট্রিটের একটি বেশ বড়ো সিগারেটের দোকান থেকে কিনে | সিগারেট শুরু করার বিশেষ ইচ্ছে আমার ছিল না | মনে হতো গলায় খুব গরম লাগবে আর জ্বালা করবে | আমার এক বন্ধু বললো মেষ্টল সিগারেট খেতে | কোনো অসুবিধে হবে না | বন্ধুরা অনেকেই তখন সিগারেট ধরে ফেলেছে | আমি যেন পিছিয়ে থাকছি -- এই বোধ থেকেই বোধহয় একদিন লিভসে স্ট্রিটের দোকানটি থেকে দুটি ডানহিল মেষ্টল সিগারেট কিনে ফেললাম | ১৯৮৬ সালেও এক একটি সিগারেটের দাম পড়েছিল দেড় টাকা করে | বেশ লাগলো সেই মেষ্টল সিগারেট | মেষ্টল ছেড়ে সাধারণ সিগারেট ভালো লাগতেও বেশি সময় লাগলো না | ঠিক ১৩ বছর পর অনেক চেষ্টায় নিকোটিন প্যাচের প্যাঁচ কষে এই নেশাটি তাড়াতে হয় | সেই সিগারেটের দোকানটি বেশ চুটিয়ে ব্যবসা করছে দেখলাম | আরো অনেকে আমার মতো নিশ্চই নেশার কবলে পড়ছে প্রতিদিন |

তারপর চুকলাম নিউ মার্কেটে | ছোটবেলায় মাসীমণি আর মায়ের সঙ্গে খুব আসতাম | ওঁরা চলে গেছেন | ওঁদের প্রিয় দোকানগুলো কি আছে এখনো ? এই পরিবর্তনের কলকাতায় ? নিউ মার্কেটের এক একটি অংশে এক একরকম গন্ধ | সেই বর্ষার সন্ধ্যায় আমার খুব ইচ্ছে হলো Nahoums এর গন্ধ পেতে | বৈশালীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করলো ছোটবেলার সেই স্বাদ | সেই আবেশ | পৌঁছে গেলাম Nahoums এ | মাসীমণির অফিস ছিল ধর্মতলায় | ছোটবেলায় মামাবাড়ি এলে রোজ আমার বরাদ ছিল এই দোকানটির হার্ট কেক | আরেকটু বড়ো হলে rum ball | দুরকম কেক ই পাওয়া যাচ্ছে দেখলাম | বেশ কয়েকটি বাক্সবন্দী করে নিলাম | কাশ্মীরি সালের দোকান , নানারকম জামাকাপড়ের দোকান বেশ ভালোই ব্যবসা করছে | মনে হলো মল কলকাতার হাত বাঁচিয়ে নিউ মার্কেট দিবি চালিয়ে যাচ্ছে |

নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে গ্র্যান্ডের দিকে এগোলাম | বুপসি নিউ ক্যাথে বার চলছে আগের মতোই | এই বারে বসেই বন্ধু অর্জুনের সঙ্গে বিলেত আসার সিদ্ধান্ত নিই | আজ রাতেও নিশ্চই কেউ কেউ কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ওই আলো আঁধারি মাথা বারে বসে | হতশ্রী লাগলো গ্র্যান্ডের নিচের এলাকাটি | কুৎসিত নীল প্লাষ্টিকের ছাউনিতে ছড়িয়ে রাখা মাঝুলি জিনিসপত্রের পসরা | মেট্রো সিনেমা প্রায় ধংসস্তুপে পরিণত | Metro Goldwyn Mayer এই সিনেমাটি চালু করে ১৯৩৫ সালে | শুনলাম মুম্বাইয়ের এক ব্যবসায়ী এটি মাল্টিপ্লেক্সে পরিণত করতে চলেছেন | Symphony তখন বন্ধ হয়ে গেছে | মনে হলো কোনোরকমে ধুঁকছে | বিলেত আসার আগে Beatles এর কালেকশন কিনেছিলাম দুটি ক্যাসেটে | এখনো দিবিয় চলে | Symphony উঠে গেলেও রয়ে যাবে ক্যাসেট দুটি | রাত হয়ে আসছিলো | বুঝতে পারছিলাম হোটেলে ফেরা দরকার | নাহলে আরো অনেক স্মৃতি ঝাঁকুনি খাবে প্রবলভাবে | ঘরে ফিরে এসে ভিট্টোরিয়ার দিকে তাকালাম | কিছু দেখতে পেলাম না চাপ চাপ অদ্বিতীয় ছাড়া | হয়তো রাত হলে ভিট্টোরিয়ার আলো নিভিয়ে দেয়া হয় | চৌরঙ্গীর রাত মনে হলো না খুব একটা রঙিন | বর্ষণক্লান্ত সেই রাতে চৌরঙ্গীর যেন ঘুমোনোর তাড়া ছিল |

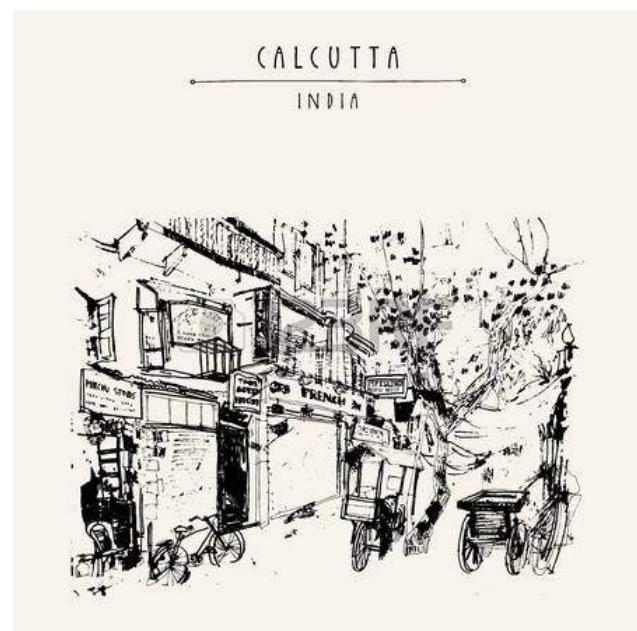
বছর দশেক ধরে এক বিরাট মাপের মানুষের মেহ আর ভালোবাসা পেয়ে আসছি | কোনো কারণ ছাড়াই | পরদিন সকালে পৌঁছে গেলাম ভিট্টোরিয়া হাউসে | তাঁর অফিসে পৌঁছতেই সেক্রেটারি বললেন -- যান, আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন | দরজা একটু ফাঁক করে -- 'দাদা, আসবো?' বলতেই সেই স্নেহমাখা কষ্ট -- 'আরে এসো এসো' | ৮২ বছর বয়েসে প্রবল বৃষ্টির ভেতর দক্ষিণ কলকাতা থেকে ভিট্টোরিয়া হাউসের অফিসে পৌঁছে গেছেন স্বাধীনতা উত্তর বাংলার সব চেয়ে জনপ্রিয় লেখক -- শঙ্কর | মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় | চা এসে গেল মুহূর্তের মধ্যে | শুরু হলো নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা | আলোচনার মূল বিষয় ছিল চৌরঙ্গী | চৌরঙ্গীর স্রষ্টার কাছ থেকে জানার



ইচ্ছে ছিল শাজাহান হোটেল কোনো হোটেলের ছায়ায় লেখা | কেউ বলেন গ্র্যান্ড -- কেউ বলেন গ্রেট ইষ্টার্ন | শক্তির বললেন Spence's Hotel এর ছায়ায় তৈরী করেছিলেন তিনি শাজাহান | Spence's যাত্রা শুরু করে ১৮৩০ সালে | এশিয়ার প্রথম বড় মাপের এই হোটেলটির স্থপতি জন স্পেন্স | হোটেলটি পরে গবর্নর হাউসের কাছে ওয়েলেসলি প্লেস এ উঠে আসে | স্বাধীনতার কিছুদিন পরে হোটেলটি বন্ধ হয়ে যায় | জুলাই তার্ফের ১৮৮০ সালে লেখা তাঁর 'The Seam House' উপন্যাসে এই হোটেলের উল্লেখ করেছেন।

আলোচনায় এলো সীমাবদ্ধ আর জন-অরণ্য উপন্যাসের কথা | চৌরঙ্গীর নানা ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর এই উপন্যাসে | উপন্যাস থেকে ছায়াছবি হয়ে ওঠার অনেকে কথা জানতে পারলাম | বাইরে রিমবিমে বৃষ্টিভেজা চৌরঙ্গী -- আর আমি 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের স্বষ্টার কাছ থেকে নানা অভিভ্যন্তর কথা জানতে পারছিলাম | এক সময় উঠতে হলো | শক্তির ওঠার সময় বললেন -- 'তোমাকে যে কি দিই?' আমি বললাম -- 'আমার মতো নগণ্য মানুষকে যে সময়, যে স্নেহ দেন, তার চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে? প্রবীণ লেখক তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'একাদশ অশ্বারোহী'র একটি কপিতে সন্মেহে কয়েকটি লাইন লিখে আমার হাতে তুলে দিলেন | অনেকটা ভালো লাগা নিয়ে বেরিয়ে এলাম ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে | বাইরে তখনো বিপরিপে বৃষ্টি | চৌরঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো আমার চেনা চৌরঙ্গী, অনেকের চেনা চৌরঙ্গী কত বদলে গেছে | ভবিষ্যতের পথ বেয়ে আরো কত রদবদলের হাতছানি | কিন্তু বেঁচে থাকবে চৌরঙ্গী উপন্যাসের ভেতর অনেক মানুষের অনেক স্বপ্ন -- অনেক স্বপ্নভঙ্গ | একেই বোধহয় বলে কালজয়ী সৃষ্টি।

ফিরে এলাম হোটেলের ঘরে | চোখ গেল গ্র্যান্ডের ছাদের দিকে | এবার যেন দেখতে পেলাম গোমেস সাহেবকে | শুনতে পেলাম ওনার বেহালা | মনে হলো যেন স্যাটা বোস আর সুজাতা মিত্র ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন | ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে মুখ করে | হয়তো আলোচনা করছেন সুজাতা মিত্রের পরবর্তী উড়ানের কথা | দিনের আলোয়, নরম সবুজ ভেজা ময়দান পেরিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।





## হনুরাসে হাহাকার

### রঞ্জন ঘোষাল

”হনুরাসে হাহাকার” লিখে ফেলে কেচ্ছা হয়ে গেছিল গড়পারের লালমোহনবাবুর। দিল্লীতে হনুরাস সরকারের একটা ছোটো মিশন আছে। ল্যাটিয়েন্স দিল্লীর ডিপ্লোম্যাটিক এক্সেন্টে ভাড়া অত্যন্ত বেশি বলে হনুরাস সরকার সাউথ দিল্লীর কালকাজী অঞ্চলে একটা ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে অফিস চালায়।

সেখান থেকে লালমোহনবাবুর কাছে একটা ফোন আসে।

কী লিখেছেন এ সব আবোলতাবোল? হনুরাসে রাষ্ট্রবিপ্লব? যুমন্ত আগেয়গিরি হঠাতে জেগে উঠেছে? কোথায় পেয়েছেন মশাই আগেয়গিরি হনুরাসে? আবার লিখেছেন ডিটেকটিভ প্রথর রুদ্র আমাদের হনুরাস প্রেসিডেন্টের বাড়ি গিয়ে পান্তোভাতের নেমন্তন্ত্র রক্ষা করে এসেছেন!

লালমোহন বাবুর তখনও ভালো করে ঘূম ভাঙেনি। তা ছাড়া ”হনুরাসে হাহাকার”তো অনেক আগেকার লেখা। হঠাতেই পুরোনো কাসুন্দি নিয়ে ...” কাকে, কাকে বলছেন আপনি”? লালমোহনবাবু টেলিফোনের অপর প্রান্তের মানুষটিকে প্রশ্ন করেন।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম পেত্রো ওলাঞ্চো। আমি রিপাবলিক অফ হনুরাসের ইতিয়া মিশনের ফার্স্ট অফিসার।

লালমোহনবাবু বললেন, আপনি চমৎকার বাংলা বলেন দেখছি।

পেত্রোবাবু বললেন, এতে আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? প্রথর রুদ্র তো যেখানে যান, বাংলাতেই কাজকর্ম চালান। আপনার উপন্যাসগুলো পড়ে মনে হয় পৃথিবীর কোনো লোকের সকালে উঠে সহজপাঠ আর কিশলয় পড়ে বাংলাটাকে দুরুস্ত করে রাখা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

লালমোহনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, না, না আমি বা আমার পাঠকরা তো আর হনুরিয়ান ভাষাটা জানি না, তাই বাংলা দিয়েই কাজ চালাই। তা আপনি –

পেত্রোবাবু বললেন, আমাদের ভাষা স্প্যানিশ। হনুরান বা হনুরিয়ান নামে কোনো ভাষা নেই। যেমন ইতিয়ান নামে কোনো ভাষা নেই। যাই হোক। আপনার “হনুরাসে হাহাকার”-এর একটা সিআইএ-কৃত ট্রান্সলেশন আমাদের হাতে এসেছে। এ ব্যাপারে আপনাকে একবার দিল্লী আসতে হবে। আর হ্যাঁ, আপনার পাসপোর্ট করা আছে তো?

\* \* \*

হনুরাসের দিল্লী এমব্যাসিতে মোট চারজন কর্মচারী। হিজ হাইনেস দি অ্যাম্বাসাদর - রিকার্ডে আলভারেজ নিজে, ফার্স্ট অফিসার পেত্রো ওলাঞ্চো, সেকেন্ড অফিসার গিয়ের্মো পালাচিও আর গোবিন্দ তপাদার, অফিস বয় কাম ড্রাইভার।

দিল্লী এয়ারপোর্ট টার্মিনাল টু থেকে গোবিন্দবাবু নিতে এসেছিলেন লালমোহনবাবুকে। অ্যাম্বাসেডার গাড়ি। পথে গোবিন্দবাবু একবার থামলেন পান কিনতে। একজনকে গাড়িতে তুলে নিলেন, সে হাউজ খাসে নেমে গেল। গোবিন্দবাবু হাত বাড়িয়ে ঠিক ক”টাকা নিলেন লোকটার হাত থেকে সেটা লালমোহনবাবু দেখতে পেলেন না। গোবিন্দবাবু পান-খাওয়া দাঁত বার করে লালমোহনবাবুকে বললেন, এই মাইনেয় পোষায় না মশাই, তাই দুটো উপরির ব্যবস্থা করে নিতেই হয়। তা স্যার আছেন কদিন?

লালমোহনবাবু বললেন, তা তো আমায় কিছু বলা হয় নি। তবে আমাকে অক্ষয় ত্তীয়ার আগে ফিরতেই হবে। প্রকাশকেরা ঐ সময়ে কিছু পার্বণী-টার্বণী দ্যান কিনা।

গোবিন্দ তপাদার উদার মানুষ। বললেন, দিচ্ছে যখন ফোকটে, নেবেন না-ই বা কেন? তা এখানে কীসের রগড়ানি খেতে এলেন?

রগড়ানি? লালমোহনবাবুর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। উনি গভীর চিন্তায় পড়লেন। ছুট বলতেই এভাবে দিল্লী চলে আসাটা ঠিক হয়নি। তার ওপর সঙ্গে আবার পাসপোর্টখানা। ওটি কেড়ে রেখে দ্যায় যদি এরা?

হনুরাস মিশনের ফ্ল্যাটটি আসলে ঠিক ফ্ল্যাট নয়, একটা দোতলা বাড়ির একতলাটা শুধু। গাড়ি থেকে নামতেই দরজায় পেত্রোবাবুকে দেখা গেল। উনি হৈহৈ করে উঠলেন। আসুন আসুন লালমোহনবাবু। আপনার খাতিরদারিরই ব্যবস্থা হচ্ছে।

লক-আপে ঢোকানোর আগে পুলিশের লোকেরা এ রকম ডায়লগ দেয় বটে। আতঙ্কিত লালমোহনবাবু ভেতরে চুকে দেখলেন সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। একজন গেঞ্জি আর গামছা পরে শিলে ছক্ষু করে মশলা বাটছেন। জানা গেল ইনিই সেকেন্ড অফিসার, গিয়ের্মো



পালাচিও।

ভেতরের দিকে অফিস ঘর আর তার পাশেই রান্নাঘর। সেখানে এক ভদ্রলোক কী খুটখাট করছিলেন। পেঢ়োবাবু বললেন, হ্জি হাইনেস সিনিওর আলভারেজ, ইনিই মি.লালমোহন গাঙ্গুলি।

রিকার্ডো অ্যালভারেজ ভুরু তুলে প্রশান্ত কঢ়ে বললেন, রক্তবরণ, মুঞ্চকরণ, / নদীপাশে যাহা বিধিলে মরণ? আপনারা পিওর ঘটি তো? মাংসে একটু চিনি চলবে আশা করি! আমি অবশ্য এখন জাস্ট ম্যারিনেট করে রাখছি। কীরে গিয়ের্মোর ব্যাটা, তোর পেঁয়াজ বাটা হল?

-এই যে হয়ে এসেছে স্যার।

অ্যামবাসাড়ার তখন অফিসবয় কাম ড্রাইভার গোবিন্দ তপাদারকে বললেন, গোবিন্দবাবু, আপনি তাহলে এবার চিত্ররঞ্জন পার্কটা হয়েই আসুন। দইটা মিষ্টিটা নিয়ে চলে আসুন একেবারে। আর শুনুন, চেঙ্গটা আমায় ফেরৎ দিতে ভুলবেন না কিন্তু।

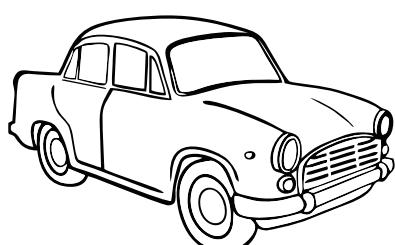
গোবিন্দবাবু একহাত জিভ কেটে বেরিয়ে গেলেন।

অ্যামবাসাড়ার অ্যালভারেজ হাতটাত মুছে অফিসঘরে এসে বসলেন। বললেন, বসুন লালমোহনবাবু। আপনি আমাদের দেশ সম্পর্কে বহু ভুলভাল লিখেছেন। শুনুন রাষ্ট্রবিপ্লব টিপ্পুর নয়। কিছু লোক আখ, মানে ইক্ষুদণ নিয়ে আর এক দলের ওপরে একবার চড়াও হয়েছিল। বলেছিল নতুন গরমেন্ট কী ফার্টিলাইজার ছেড়েছে বাজারে, আখে কেবল ছিবড়ে বেরংছে। আপনি সেটা নিয়েই সাতকাহন করে ফেললেন। লিখলেন রাষ্ট্রবিপ্লবে খুনখারাবা চলছে, সেখানে প্রথর রুদ্রের পক্ষে একজন বিশেষ হ্যাকারীকে খুঁজে বার করা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতই অসাধ্য কাজ। সে অসাধ্যও উনি সন্তুষ্ট করে ফেললেন, পাহাড়ের স্লোপে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি যখন সহসা জেগে উঠেছে, পেছনে তাড়া করছে ফুটন্ট লাভা, আর আপনার প্রথর রুদ্র ক্ষি করে পেছু নিয়েছেন অপরাধীর। এবং ক্ষি-রত সেই মি. রুদ্রের একটি মাত্র বিষ তীরের ঘায়ে অপরাধী রোবার্টো মারাদিয়াগা ঘায়েল। এ বিষ-তীরের আবার মায়ান্ সভ্যতার শেষ বংশধরের কাছে থেকে বাগানো। এই তো? তা, আপনি তো গুলিখোরের মত লিখেই খালাস। এদিকে আমেরিকার সি-আই-এ, ইজরায়েলের মোসাদ আর রাশিয়ার কেজিবি আমাদের প্রাণ যে ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। আমেরিকা বলছে, সে কী? হন্দুরাসে বিপ্লব ধূঁইয়ে উঠেছে, তোমরা বছর বছর আমাদের বিলিয়ন ডলার করে খাচ্ছো, আর কিছুই সামলে উঠতে পারছো না? ইজরায়েল সন্দেহ করছে আপনার বর্ণিত জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি আর কিছুই নয়, একটা নিউক্লিয়ার টেস্ট সাইট। না, না লালমোহনবাবু, আপনাকে একবার তেগুচিগাল্পায় আসতেই হচ্ছে। আমাদের রাজধানী। নিজের চোখে দেখে হন্দুরাসে হাহাকারের একটা বিপরীত চিত্র আপনাকে আঁকতে হবে এবার।

\*\*\*

তেগুচিগাল্পায় নেমে লালমোহনবাবু হতবাক। এয়ারপোর্টের টারম্যাকে অগুনতি হাতে টানা আর সাইকেল রিকশ। নিয়ম কানুনের কোনো বালাই-ই নেই। “আসুন বাবু এদিকে”। “আইয়ে বাবু”, “কুন হোটেলে যাইবেন বোলেন। চার টাকা লিব” করে সবাই ছেকে ধরেছে। কী কাণ্ড! এমনকি মোগলসরাই স্টেশনের বাইরের চতুরটাও এর চেয়ে ডিসিপ্লিন্ড।

একটা লিমুজিন দাঁড়িয়ে আছে লালমোহনবাবুর জন্য। লালমোহনবাবু সেটা দেখতেই পাচ্ছেন না। সেই গাড়ির লিভেরি-সজ্জিত শফার দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপনমনে বলে উঠল, অবাক হোস্নি পঞ্চ, এ ভবপ্রপঞ্চ হল মায়াকানন। তাই তো চাণক্যমুনি বলেছেন, যার যেমন কল্পনাশক্তির দৌড়, সে তেমনটাই পায়। যাদৃশী ভাবনা যস্য, ইত্যাদি।





## পরীরা এখনো আছে সৌমিত্র চ্যাটার্জি

বাড়ি ফিরে মেয়ের ঘরে অভ্যাস মত উঁকি দিল সুজয়। উফফ !! আবার, আবার মেয়েটা সেই একই কাজ করছে। রেগে গেলো সুজয়। সাত বছরের মেয়ে রূপসার ঘরে চুকে জোরের সাথে বললো, ‘আবার, মামনি, তুই ওগুলো পরছিস?’ চমকে গেলো রূপসা। বাবার আসা সে দেখতেই পায়নি। এতক্ষণ ছেট মেয়েটা ভেসে বেড়াচিল রূপকথার দেশে। সামনে খোলা ঠাকুমার ঝুলি। লালকমল ও নীলকমল দের সাথে সেও ব্যস্ত ছিল রাক্ষস- খোক্সদের সাথে যুদ্ধ করতে। হঠাৎ বাবার গলা শুনে কিছুটা ভয় পেলো সে। তাড়াতাড়ি বইটা লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করলো অঙ্ক খাতার মধ্যে। বইটা কেড়ে নিলো সুজয়। ‘কতো বার না তোকে বলেছি এইগুলো পড়বি না। যতসব আজগুবি গল্প কথা’।

‘কিন্তু বাবা .....’ ক্ষীণ প্রতিবাদের স্বর ভেসে গেলো গন্তীর নিনাদে। ‘বই পড়তে হয় ভালো বই পড়ো। মহাপুরুষদের জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, কিন্তু No fairy tales.’ নিষ্পাপ মুখের উপর সশব্দে বন্ধ হলো দরজা।

ডঃ সুজয় ঘোষ নামকরা হার্ট স্পেশালিষ্ট। তার সাত বছরের মেয়ে রূপসাকে নিয়ে ২ বছর হলো এসেছে বাইপাস এর ধারে এই গগনচূম্বী মিনারে। নিজের ঘরে চুকে বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানার এক কোনে। রাগ হতে লাগলো তার নিজের উপর। তার কত আশা মেয়েকে সে বানাবে তার মত মস্ত বড় ডাঙ্গার। তাই সে মেয়েকে বোঝায়- বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এই বিজ্ঞান ই হচ্ছে আসল। বাকী এই রূপকথা ফুপকথা সব বোগাস। একদম Trash. কিন্তু মেয়েটা ও হয়েছে সেই রকম। কিছুতেই শোনে না। আসলে ওর মায়ের স্বত্বাব পেয়েছে। ছোট থেকে ওর মা শতাব্দী ওকে এইসব রূপকথার গল্পই শুনিয়েছে যে। শতাব্দী একটা মেয়ে স্কুলের বাংলার দিদিমনি। কি সুন্দর করে বলতো এই রূপকথার গল্প। ওই রূপকথাতেই তো মজেছিলো সুজয়। ভালোবাসার মায়াড়োরে বাঁধা পড়েছিল সে। মেয়ে খালি মাকে জিজেস করত- ‘মা, পরীরা কি এখনো আছে? তাঁরা কোথায়?’ রূপসার কথায় হো হো করে হাসতো সুজয়। বলতো, ‘রূপু ওসব নেই রে’। রেগে যেতো শতাব্দী। ‘সবকিছুই কি তুমি বিচার করো Science দিয়ে? জীবনটা বিজ্ঞান নয় সুজয়, এটাকে কবিতার মতো ভাবতে পারো না কেন?’

পারেনি সুজয়। তাই কবিতা বিজ্ঞানের দরজায় শুধু বার বার আছড়ে পড়েছে। দরজা খুলে চুকতে পারেনি। একদিন দরজা বন্ধ দেখে চলেও গেছে। হার্ট স্পেশালিষ্ট সুজয় নিজের জীবন হৃদয়কে জোড়া দিতে পারেনি। ভালোবাসার সেই আমোঘ মন্ত্র ‘যদিদং হৃদযং তব’ আজ ভেঙে খানখান। তাই আজ সুজয় উঠে পড়ে লেগেছে মেয়ের পেছনে। মুক্ত করবেই তাকে মায়ের বিশাল ছায়ার থেকে। না পেরে এখন তাই তার ব্যর্থতার যন্ত্রণা। চিঢ়কার করে বিশাল ঘরে সে বলে উঠল, ‘না নেই নেই, কোথাও নেই পরীরা’। সারা ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো সুজয় এর কথা, নিঃসীম এক শূন্য হাহাকারের মতো।

মাস কয়েক বাদে এক আধাৰ রাতে ছেট রূপুর হঠাতে করে বাধলো জুৱ। বাড়তে বাড়তে ১০২-১০৩-১০৪। বাড়ির কাজের লোক বার বার মাথা ধুয়ে দিয়ে জুব কমাতে পারছিলনা। সুজয় এতো বড় ডাঙ্গার কিন্তু অসহায় ভাবে দেখছে মেয়ের কষ্ট। সমস্ত বড় বড় ডাঙ্গার যারা সুজয় এর বন্ধু ও বটে, এসে দেখে গেছে রূপসাকে। ও তো শুধু সুজয়ের নয়, তাদেরও মেয়ের মতো। জুবের ঘোরে রূপসার শুধু একটাই প্রলাপ ‘মা মা মা’। ‘সুজয় তুই শুধু একবার শতাব্দীকে ফোন কর’ - ওর বন্ধু অঞ্জন বললো তাকে! ‘অসন্তুষ্ট’ - ‘জেদ করিস না সুজয়’। দেখছিস রূপুর এই অবস্থা। এই সময় সন্তা সেন্টিমেন্ট ভুলে যা। নাহলে মেয়েকে আর ফেরেৎ পাবি না। শেষ কথাগুলো বুকের ভেতর প্রচঙ্গ আঘাত করলো সুজয়কে। তার আদরের রূপু হারিয়ে যাবে। না তা হতে পারে না। কাঁপা কাঁপা হাতে সে ডায়াল করতে শুরু করলো মোবাইল এর বোতাম- ৯৮৩০০.....।

কয়েকদিন পর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল সুজয়। মনটা আজ ভীষণ ভালো। খবর নিয়েছে রূপসা আজ ভাত খেয়েছে। আসতে আসতে রূপুর ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। শতাব্দীর কোলে শুয়ে ছেট মিষ্টি রূপসাটা শুনছে রাজকন্যার গল্প। সেই গোধূলি ক্ষণে দেখা আলোয় সে নতুন করে দেখল আবার শতাব্দীকে। মনে হচ্ছিল এই তো সেই ‘পরী মা’ যার ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়েছিল cindrella. ফিস ফিস করে সে বললো, ‘আমি ভুল বলেছিলাম রে মামনি, পরীরা এখনো আছে।’



## My Visit to Stockholm

Sayani Pathak (Grade 3)

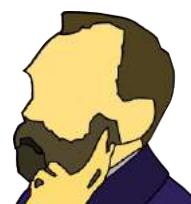
I went around Stockholm, I found it a nature friendly city. I have been to a duckpond to feed the ducks. I have also been to lake Malar , the second biggest lake in Sweden. We walked to the lake by the forest path and believe me, its huge ! And so much like a real woods as we saw a small beetle and a wild squirrel. The squirrel was looking at us. We walked around 6 kilometres through the dim, uneven , steep woods. The lake was more like a sea and I saw loads of huge waves, ducks (one came next to me) and seagulls.

In Gamlastan, I saw the Royal Palace of Sweden, the royal armoury, where I could find some Swedish history. Then we walked to the bank of Baltic's . We managed to catch the boat ride, and soon we were sailing through the deep blue Baltic sea. The weather was sunny and there was a pleasant breeze in the air, that I liked. We passed some islands and one of them was Gronalund, an amusement park like we have in England. Though looking at the rides made me a bit dizzy. As we sailed back to the mainland Stockholm I looked at the greenish blue waves hitting our boat.

I have also visited the famous Nobel Museum where I saw the picture of the great poet Rabindranath Tagore.

The part I liked best about my holiday was when I went to a zoo called Skansen ! In Skansen I saw lots of nordic animals. When I saw the huge black bear, it was sleeping. Same with the artic wolves. As the nordic owls stared at me I stared back at them. We saw an elk laying down as well but the part I liked best was the seals. The great grey seals were going to be fed at 2 o'clock and lots of people wanted to see, so I went early and got a front row, really really close to the seals. We had to wait half an hour, but I guess the seals got really hungry waiting because one of them jumped up to the wooden platform where they are fed ! And another seal after swimming for some time lifted its head out of the water and waited until the zookeepers came and finally fed them one not very big bucket of fish each.

For now bye bye Stockholm, but I want to comeback soon here again.





## Invisible Tears

### Sagnik Palit

The boy had been cornered near the dustbin by a group of students. Not only boys.....there was also a girl among them. Their leader was well-built and athletic and his voice was full of authority. He stood nearest to the boy, piercing him with stern and serious eyes. He looked as if the matter was immensely grave and his face gave away nothing. But in his heart he was enjoying himself. The boy in front was silent and had already understood what was going on and knew exactly what was going to happen. He could give anything for not being in that situation at that moment.

It had all begun when the boy had caught a couple of students stealing money. Not that he cared, but it was his friend's bag that was being robbed. It was hard for him to make any friends in that new school, thanks to his autism. He had managed to make one, anyway. So he went to the boys and warned them not to steal. They ignored him and went on with what they were doing. The boy did not say anything more. He did not even tell his friend about this, perhaps he should have. In the next period, he went to the teacher and accused the two boys of theft. Obviously they denied it and so did the rest of the class, although most of it was not even present there. The boy was scolded for having lied. The boy whom he had caught stealing happened to be the monitor of the class and also the topper. But the boy still did not understand what authority it gave him to do as he pleased. Now, he could witness it in front of his eyes.

The leader, who was also a thief, pinned the boy to the wall and lips curled into a smile. It did not have any warmth in it but was full of wickedness. The other boys had started calling him names. He could not make out what it was but it was nothing good. He felt numerous voices chanting something around him though there were only a few boys. Nobody stood up for the boy. The leader was very popular among the students. The entire class stood there, watching and laughing. The boy tried to cover his ears but his hands were already clasped by another boy. He was hit in his stomach by the leader and the blow almost drew the air out of him. A few boys splashed water on his face but the boy remained silent.

Suddenly the boy found himself in darkness. He knew that he had ADHD and his brain could not take all the noise at once. He felt nothing. He felt like a lost soul without a source or a destination. Nobody cared for him. He felt that nobody was out there for him. The boy knew that he was weak in his studies and equally dull at every aspect of





learning. His parents had told him that it hardly mattered, but they had lied. It did matter. The world was not for him. There was no point in living. Suddenly the boy did not want to live. He had lost all hope. He had given in.

He was brought back to reality when he felt the pain shoot through his lower jaw. The leader had landed a punch under his chin. The boy sank to the ground, spilling the contents of the dustbin on himself. A few boys threw food at him and chanted a single name that he still could not make out. He saw a familiar face from the corner of his eyes. It was his one and only friend. He smiled at him and splashed water on his face. Now the boy could take it no more. He began to weep. Nobody noticed as there was enough water on his face to hide his tears. The leader made his last blow just after the bell rang. A kick placed squarely on his chest. The boy wailed and was blinded by pain for a moment. The crowd around him had melted away. The boy was lying there on the ground, drenched till his waist, with bits of food on his shirt. The girl emptied her bottle on the boy's head and the boy was left alone. He could not move, he could not cry. Then the final bell rang and he got up with much difficulty. He staggered back to his bench and took his seat. Then he looked around himself.

It seemed as if everyone had forgotten the matter as soon as it had ended, like a bad dream. The boy looked at the blackboard and kept staring at it, blankly.



## LET'S FIND OUT

1. Which Indian month Durga puja is celebrated?  
a. Ashwin      b. Chairt      c. Bhadrapad      d. Kartik
2. What is another name for Durga Puja in other parts of India?  
a. Diwali      b. Holi      c. Navaratri      d. Ganesh puja
3. Which festival is celebrated on the last day of Durga Puja?  
a. Holi      b. Dussehra/Vijayadashami      c. Kali puja      d. Baisakhi
4. What is the name of the asur whom Ma Durga defeated before Durga Puja?  
a. Mahishasur      b. Raavan      c. Kumbh      d. Shukr
5. What is another significance of Vijayadashami?  
a. Ram came to Ayodhya      c. New Year  
b. Ganesh's birthday      d. Ram defeated Raavan
6. Who is Ma Durga's husband?  
a. Indra      b. Ram      c. Shankar      d. Krishn
7. Where does Ma Durga reside with her family?  
a. Indian ocean b. Kailas Parvat c. Patal      d. Swarg / Heaven
8. How many hands Ma Durga has?  
a. 8      b. 12      c. 10      d. 16





## Money Vs Happiness

Reshma Ghosh

Yes, I know this topic has been discussed, analyzed, time and again, without any permanent solution.

I am still in a dilemma and so are the researchers.

Recently I was watching a Comedy Show, a source of Happiness where I heard Ekta Kapoor (Queen of Indian Television, Producer of Films, Television Series...) mention that most of her decisions lead to monetary benefits however few are made only for happiness. She said she decided to promote and distribute a bold and strong movie "Lipstick Under My Burkha" to spread awareness among audience, not bothering about BOX Office numbers.

A successful celebrity like her can invest in such ventures once in a while, but can a poor rickshaw puller choose to sit at home and enjoy a sunny day just for happiness?

### **Before moving forward let's try to understand what is money?**

Money, in and itself is nothing. It can be a leaf, metal coin, piece of paper with historic image on it but derives its value only by being a medium of exchange, a unit of measurement. Of course, Honorable PM Mr. Narendra Modi did a great job in teaching us the value of money with Demonetization. I am sure 90% of Indian Population experienced immediate grief with this decision but in the long run the same 90% would be glad, hopefully.

In this materialistic world the ultimate goal is to grow up, be capable to earn Money and the rest (respect, family, love, happiness) is believed to follow automatically. When I earned my first salary, yes I was super happy.

With fresh money in my bank account the first thing I did was sent flowers and gifts to my parents. Then I invited my friend for a treat. I experienced joy by spending that money and not by keeping it to myself. So, money did give happiness BUT a temporary one.

### **Technically happiness is more than just an emotion.**

It is a combination of how satisfied you are with your life and how good you feel daily. Happiness to me, is the onset of spring, fresh blossom, exuberance of bright colors all around. It is in a warm hug from your child. Good to know that, The United Nations declared 20 March as the International Day of Happiness to recognize the relevance of Happiness and well-being as universal goal.





## Question is can Money really buy Happiness?

Dominique Lapierre a doctor turned author, experienced spiritual rebirth in an impoverished section of Kolkata, India and named the place "City of Joy". It was amidst poverty, scarcity and slum did he experience contentment. Gautama Buddha achieved peace of mind not in the luxury and comfort of his kingdom but in sacrificing worldly desires.

Have you ever noticed the birds cheerfully chirping at the dawn, the blissful dance of peacocks while displaying its beautiful plumage, the melodious laughter of a baby, the dog wagging its tail at the sight of its master, the excitement of a child trying to catch a yellow butterfly, a delicate snow flake gently falling on your nose and the list goes on and on.

My dear friends, none of the above cost money but gives us extreme delight. Money is absolutely important to live a safe, comfortable life else we humans would have been still jumping around in the jungle surviving on instincts. Staying happy is a personal choice and of setting up priorities. Please use money to get happiness and not the reverse.

So we come back to the same point.  
Money can buy a big house but not family  
Money can buy books but not knowledge  
Money can buy toys but not playfulness  
Money can buy medicines but not life.

Money cannot buy a mother's love for its child  
Money cannot buy the blessings from parents  
Money cannot buy Happiness.

In short money can buy everything that can be valued but money **cannot buy the INVALUABLE.**

**Stay Happy!**





## Come Alive

### Srejith Nair

It had been a sunny day in June 2016 and the denizens of the Swedish terrain were more than contended with the most beautiful summer bestowed upon them. The weather apps on iphones and androids favored the barometers surprisingly. Every individual relied upon the visual forecast and never expected a drop of downpour. After a regular day at office I was just waiting to reach home and entice my tummy with yummylicious fritters. On exiting the local metro station, I found people covering their heads and running helter skelter in search of shelters. Astonishment enveloped me at the moment. The sun shone bright enough and I had been left clueless about the chaos.

I continued my walk almost ignoring the sight. Never did I imagine that this was the moment that I would begin to start looking at life in a different angle. A few hundreds of meters away from me, I could literally see a downpour. I stood there looking at it with amazement and realized that the distance between me and the rain was getting shorter in the matter of seconds. The wind slowly blew the water laden black clouds towards the direction that I had been static. I was hesitant to move even an inch from the spot and in a few moments I had been completely drenched. Even after experiencing the showers with no waterproof attires, I decided to relish the experience rather than escaping from the same. Might sound silly, but there had been a reason behind the same.

Never ever had I consciously visualized the phenomena of a downpour prior to that incident. On interrogating with many of my friends, many admitted their absence of not visualizing the condensation effect in a conscious manner. Everyone had learnt the same theoretically in our primary classes. However, most of us have never bothered to enjoy the same with our hearts and minds sunked into the process.

Nature is truly magnificent and magical. Every creation and of its is undoubtedly unique. Humans are considered to be the masterpiece of creation. There had been a time when every human being had been living in synchronization with nature, causing the damages only to minimal possible extents. Every seasonal changes had been rejoiced consciously and people lived the moment to the fullest.

Rain has just been portrayed as an example in this context. It is highly important that everybody consciously comes alive to every minute natural activity. This might look less important. But from my perspective, it is a need of the hour.





Due to technological progresses, humans have ended up being more selfish and narrow minded. Rather than protecting the flora and fauna, we have even destroyed the platforms for them to nourish. Failing to realize its beauty and importance is only reason is that we have turned more harmful. The same effect has now drifted towards the fellow human beings. Competition in all possible dimensions of life has heavily diluted kind heartedness and friends turn into foes in no time. The downfall of your neighbour is celebrated more pompously than our own successes.

A many have realized that our lives have more polluted than the drains. And it is we who are responsible for the same. 'You are the creator of your own destiny.'

The first step in solving any problem is realizing that there is one. It is the duty of every homosapien to shift our priorities to enjoy the bounties of life rather than grumbling about the thin flaws. Get submerged in nature. The rhythm of life becomes more melodious than ever. The chirping of birds, the formation of seven colours of rainbow, observing the waves of the oceans, the flight of a butterfly, sunrises and sunsets and a very few examples of the same. Get engrossed in the same. Life becomes more peaceful and busy such that one would have no time for gossips, chitchats or vengeance.

As we approach the Durga Pooja celebration, I hope that every individual becomes aware of the godliness within them and learns to honour the godliness with others. On failing to do the same, our egos would substantially leave us mentally dead.

Come Alive and Stay alive. Let us make the universe a better place to dwell.





## Climbing the peak of Inner Himalaya

### Harvinder Singh

Emotion has compelled every mortal who is capable of feeling. But through love and good intention, many human blunders have been made. To avoid pitfalls, we can learn to climb the inner Himalaya of self to take a higher view. This avenue for problem solving will help us deal with important situations.

Following the path up the inner Himalaya allows us to evolve. Through daily exercise of climbing the Himalaya, we can build up ourselves into a more masterful travellers. As we go further up the trail, there is a less temptation to stop or turn back, for we can see the rewards of such purposeful steps, We can come to see the oneness of nature.

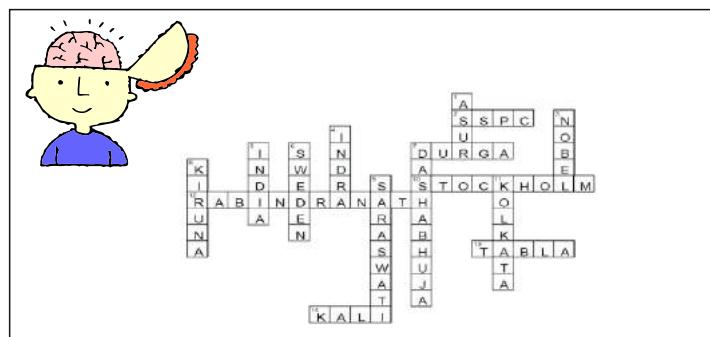
Although we are all connected in a chain of creation, each of us has a personalized road to follow. Our path is as personal as our fingerprints, We come to each new plateau of understanding from actions taken previously. We may seek direction from those who have travelled before us. But, individually, we chart our own course by decisions we make. The extent to which we want to work and accomplish determines our progress.

As we begin our ascent up the Himalaya each day, with a clarity of consciousness, we do not know how far we will go. The power of self-preservation should keep us from trying to go too fast. Yet the progress made should compel us to go ever forward.

Serious study is a guide to the wisdom necessary for our meditative climbs. Contemplation of a higher dream propels us forward.

Along the ridges of the inner Himalaya, the connection between self and the universal source of all creation become more apparent. There are many points of light where needed answers are found. There may be a deep, dark valley between each point of light. We must be willing to walk through the valleys so that we may appreciate the next point of light.

By cultivating values of the highest nature that we can comprehend, we are given thrust for furthering our journey. When a truth is emblazoned boldly upon the consciousness, we know that we do not climb the inner Himalaya in vain.





## Home from school

Omkar

I cherish the monsoon during the school days, it marked the beginning of the new academic year, new gear and the timeless fun in the rains. This poem is a tiny tribute to that golden chapter of childhood ...

\*\*\*\*\*

They have got new pairs of shoes,  
New uniforms and new backpacks,  
All charged by the vacation booze,  
Filling the air with their quacks

Seated quiet in the classroom,  
But their minds are wandering out,  
Watching the dusted roads groom,  
Enchanted by the new foliage sprout

On the grounds they go wild,  
Skidding on grass, toppling each buddy,  
Can't be controlled with measures mild,  
Whilst playing in the waters muddy

In their minds a desire springs,  
To be free and drift alike in dreams,  
Like a bird that dives and wets its wings,  
Like a paper boat that sails in streams

Lightning, thunders terrify and attract,  
And to each other they cling,  
Taking the showers along the tract,  
Though raincoats they all bring

The kids are unhurried and merry,  
Jumping and falling in every pool,  
Drenched, hungry but devoid of worry,  
While walking back to home from school

## The goodness thrives

Omkar

Nature has many good things to teach,  
good values to inculcate; the below  
lines are a summary of a very few of those!

\*\*\*\*\*

I wish like the Wind be my Spirit,  
With eternal freedom bestowed,  
Wild ; strong to take any hit,  
Cooling, merry and proud

I wish like the Mountains be my character,  
With values that stand high and strong,  
Perseverance be an intrinsic factor,  
Bravery to face and fight the wrong

I wish my knowledge be like the boundless Sky,  
Shining like the stars bright lit,  
Indifferent to the birds that fly,  
And available to all under it

I wish like an Ocean be my mind,  
So vast, so deep, yet so calm,  
Hiding secrets daunting to find,  
Mighty, yet having an enthralling charm

I wish my desires be like a Tree,  
Whose life and death are both worth,  
Shade and life it gives for free,  
Of benevolence there isn't a dearth

I wish like the Water be my acts,  
All needful to the core,  
Flexible to wade through all the tracts,  
Helpful to the beings galore

I wish my existence to be like the Sun,  
Which brightens up a million lives,  
In whose wrath the evils burn,  
And under it the goodness thrives





## The Majesty of Grand Canyon

Anirban Ghosh, Silpi Datta

What is considered as one of the seven natural wonders of the world can hardly be described in a single travel review. We could write all day about what an amazing sight is ahead of you and what a spectacle it is. Yet, at the end of the day words do no justice to it.

There might be a number of “Grand Canyons” in other parts of the world. But this is THE Grand Canyon. Universally famous for the combination of large size and depth, the exposed layering of colorful rocks dates back to the prehistoric times. Perhaps it's no surprise, but the lure of the canyon induces a lot of visitors to leave the rim and head downward towards the Colorado River. Our personal recommendation is that one should always find a way to make that a part of the canyon experience, whether he/she is at the South Rim or the less-visited North Rim.

### **Day 1: Arrival**

We made it to the South Rim of Grand Canyon National Park in the month of October, where the off-season timing reduced the large numbers of people. We arrived there at late afternoon after a 240 miles (384 km) drive from Phoenix Airport. We barely managed to catch the stunning views of sunset from the Yavapai Point. The camping experience at Mather Campground, as it must be in a national park, was fun. People might find hotels outside the park boundary or can also avail the log cabins available but spending the nights so close to nature cannot be enjoyed in any better way than to camp in the park.

### **Day 2: Exploration of the South Rim**

We spent the whole next day going from one vista point to the other along the Rim Trail and Desert View Road. We were somewhat in awe of the Trail of Time that extends along the rim for what feels like miles. This starts from the Yavapai Point and continues through the Grand Canyon Village. About 2 billion years of earth's geological history, supplemented by spectacular rock specimens from the bottom of the canyon, have been exhibited throughout the trail.

Inside the park, the important vista points include Hermit's Rest (and all other points on the Hermit Road), Yavapai Point, Mather Point, Yaki Point (ideal for sunrise), Grandview Point, Navajo Point, Lipan Point (ideal for sunset) and Desert View.





One important thing we learnt from visiting the vista points is that a lot of the views look identical. The canyon is so vast that one can only get a slightly different perspective from adjacent viewing points. So it is worthwhile taking this into account when one plans to visit there. More so it also gives us a idea of its vastness and what seemed a long distance for us to get us enough tired, was actually small enough for the canyon to barely show any change in its view.

The most popular point for sunrise is Yaki Point, and that for sunset is Hopi Point in the Hermit Road. But for a quieter and serene atmosphere, we would recommend Lipan Point near the Desert View. The changing color of sunset was better than anything we have ever seen. The sharp turns and rapids of the Colorado River can be best seen from the Navajo Point on the Desert View Road. The Desert View boasts of a historic watchtower designed by famous architect Mary Colter.

### **Day 3: Deep dive into the canyon**

As it was said from time to time, one hasn't really seen the Grand Canyon until it is observed from inside of the canyon. Leaving the crowds of Grand Canyon Village behind was always a part of our plan. And we found that heading down the canyon's steep slopes gives a much better feeling for the grandeur and scale of the place.

From the South Rim, the most popular hiking trail is the Bright Angel Trail (9.5 miles one way), which is one of the two well-maintained routes to the river. It is also heavily travelled, but this is the place for first-time hikers or those who are concerned about safety. The route is broad, and rangers patrol it frequently all throughout the day. However, according to our fellow travelers, the South Kaibab Trail (7 miles one way) provides much better panoramic views all the way to the bottom, whereas the Bright Angel Trail is mostly inside a canyon, and therefore hides most of the views.

The biggest issue in the South Kaibab Trail is the safety of the adventurers. This is steeper than the Bright Angel, there is no supply of drinking water and the restrooms are not maintained during the off-season. The late summer squeezes every last drop of moisture out of the hiker whenever he/she goes deeper. It's easier going downhill, although our aging knees beg to differ. But normally people get themselves in trouble when they don't have enough resources for a trip down and back, which includes salty food, enough water and energy drinks. It seems obvious to point out, that a good pair of running shoes is recommended for canyon hiking. Anything less can bring serious trouble and can become fatal. Most importantly, no one can come and get you out of there easily if you turn an ankle or stiffen a knee.





## The Descent

The South Kaibab Trail is a 14 miles hike round trip (22 km), and attains a depth of about 1 mile from rim to river bed.

The Park Service discourages to hike down to the river and then climb up to the rim in a SINGLE day. However, we tried our luck and extracted the last bit of our strength to prove them wrong. And glad we are that we did.

We left our car at the visitor center, took the shuttle bus to the trailhead (since there is no designated parking there), and started before sunrise. Just below Yaki Point, the trail begins with a series of switchbacks. From Ooh Aah Point, the trail follows the top of a ridgeline through Cedar Ridge (1.5 miles from rim). After that, the trail traverses below O'Neill Butte to Skeleton Point (3 miles from rim) without a single switchback. Thereafter, the trail descends rapidly towards Tip Off (4.4 miles from rim) via another series of switchbacks.

The rangers recommend using this trail to descend only, because it is very steep and shadeless, but offers stunningly dramatic views. By the time we reached the Kaibab Suspension Bridge, one of us managed to get a stiffened knee and another got back pain. Though we were overwhelmed by the breathtaking views, carrying DSLR cameras and big lenses felt like a big burden, forget about using them. After reaching the Bright Angel Campground (7 miles from rim) at the bottom end of the canyon, we became little tensed thinking about the upcoming ascent. The whole descent took nearly four hours, which was pretty awesome considering our rusted joints.

## The Ascent

Though the slightly longer Bright Angel Trail (9.5 miles one way) is much shadier and less steep, we again chose the South Kaibab Trail (7 miles one way) for the ascent; just to save the two and a half extra miles. When we started the epic ascent, we felt like lying down on the stones and prayed for some miracle to happen which will teleport us to the rim. We desperately wanted that in the whole ascent of eight hours with the increasing pain that one of us was suffering from the stiffened knee. Asking for help from park rangers went in vain. We would not have survived severe dehydration if not for some of our fellow travelers who helped us with ample water, energy drinks, and some herbal treatment for the knee.

Near the Ooh Aah Point a heavy thunderstorm started along with a drizzle. The strong gusts of winds gave us a challenge to keep the body balance intact along the edge of the





trail and not take a shortcut to heaven. To add to our misery, our sunglasses went flying and forced us to withstand the dust with bare eyes. Thanks to a piece of rock where they got stuck and we could recover them.

The last quarter of the hike was the most frustrating one. It looked like we had almost made it to the top for the last two hours or so, but the tight switchbacks disheartened us every passing minute. But when we finally reached the top, it was a great feeling; that we finally scaled the Grand Canyon in a single day.

The whole hike took nearly twelve and a half hours. We started just before sunrise and finished just after sunset. We barely managed to catch the last shuttle bus which dropped us at the visitor center. The driver who had a good sense of humor managed to make us laugh by cracking jokes about our hurting feet. As we entered the Yavapai Cafeteria at Market Plaza, most people were staring at us like they have seen two Orcs from the Middle Earth. The restroom mirror gave us the answer to all those looks. Our black hairs had turned reddish brown from the canyon dust and our heads looked somewhat like thorny bushes in the deserts.

#### **Day 4: Never say goodbye**

It is needless to mention that significant time and effort were given to nurse the hurting legs and bring them to usable conditions. After the astounding experience, catching the return flight from Phoenix was our top priority.

Since that was our last camping trip in US, we decided to donate our tent and other camping gears to the National Park Service. Then, amidst a persistent drizzle, started the 240 miles drive back to Phoenix Airport.



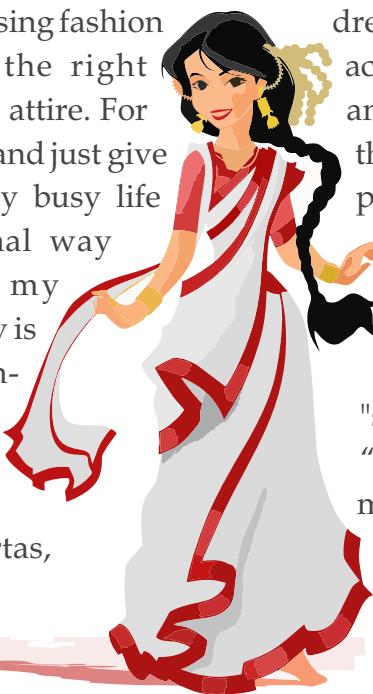


## "GET - SET - GO, CAUSE IT's PUJO"

Shyamasree Nandi

Durga Pujo more than a Festival it is an emotion for all the Bengali people. People just go crazy during these five days. Basically for us Pujo starts right after Mahalaya- the voice of Birendra Krishna Bhadra early in the morning give us goose bumps. So Durga Pujo is what we eagerly wait for the whole year.

Talking about Fashion - this is the best time to experiment with colours like Yellow, Red, Orange, Pink, Blue, Purple etc. One should opt for more of traditional attire over western outfits during this time because we are used to wearing western outfits in our everyday life. So this is the time where we can go all traditional and wear sarees, kurtis, anarkalis etc. Choosing fashion also we have to pick the right accessories and jewelleries to add more beauty to our entire attire. For example one can add a false flower as a hair accessory and just give Saree look. In day to day busy life ready in such traditional way that extra thing to that Traditional people do not get much time to get specially if one lives abroad - in situation. So for me the best mandatorily during the Durga Poure " saree while offering "saada-laal paar " Saree on the day are so very traditional. The ladies men during the Pujo should go for dhoti -panjabi (typical bengali).



Along with the attire makeup as well. With traditional dress

makeup as well to make the whole look Oh -so- Perfect. A Bindi, kohled eyes, lipstick and you are good to go! During the daytime one can avoid going heavy handed regarding makeup. It should be simple, fresh yet beautiful while the night look should be more glamorous. Apart from this one should be hydrated always because festive season means there will be no routine followed which means irregular eating patterns. So it is a must to keep sipping glass of water throughout the day. This will bring the extra glow on your face. So bring your best foot forward, forget all your sorrows and enjoy to the fullest.

one needs to go for suitable Makeup is also an essential part.

one should flaunt traditional

( Shyamasree Nandi : FASHION/BEAUTY Vlogger;  
YouTube Channel: "bewidshree")

**Samrat of India**

**অঞ্জলি লহ মোরা।**  
শারদীয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা

Män-Tors Fre	11 <sup>00</sup> -23 <sup>00</sup> 11 <sup>00</sup> -24 <sup>00</sup>	Lär Sön	13 <sup>00</sup> -24 <sup>00</sup> 13 <sup>00</sup> -24 <sup>00</sup>
-----------------	--	------------	--

contact  
Pijsuh Chowdhary  
Bondegatan 58  
115 33 Stockholm

contact  
Tel&Fax: 08-640 5281  
Mobile: 070-7780467

**ভাই ভাই লিভস**

শ্রীতি ও শুভেচ্ছা  
শ্রীতি ও শুভেচ্ছা

টোকাহোল্যবাসী কে জানাই শারদ শুভেচ্ছা  
বাংলা দেশের সুস্বাদু মিষ্টি জলের মাছ হোক,  
অথবা গ্রামবাংলার টাটকা শাকসজ্জি,  
ভাই ভাই লিভসের জুড়ি মেলা ভার

Visbyringen 4,  
Rinkeby,  
Stockholm,  
Sweden 163 73

Phone  
08 - 760 51 08  
Everyday  
0900-2300



# GRB Servicebyrå AB

Tjänsten du behöver



Hemstädning



Kontorsstädning



Fönsterputs

*Pris från 100kr/timme efter RUT avdrag !!*

**Vi använder bara miljömärkta produkter**

Kontakta oss, så berättar vi mer !!

E-post: [info@grbs.se](mailto:info@grbs.se)

[www.grbs.se](http://www.grbs.se)

Besök oss:

Stora Björnens Gata 28

SE-13664, Haninge

**NGroceries**

[www.ngroceries.com](http://www.ngroceries.com)

**N Groceries**  
Enrich Your Life

Rice, Flour, Oil, Fresh Green Vegetables,  
Fruits, General Groceries, Frozen Food

Home Delivery  
0723337729

[www.ngroceries.com](http://www.ngroceries.com)

আপনাদের জানাই শারদীয়ার প্রিতি ও শুভেচ্ছা

# RESTAURANG GANDHI

ÄKTA INDISK RESTAURANG I STOCKHOLM

We have two restaurants  
in Stockholm



NO BEEF Concept  
'Unique' in STHLM

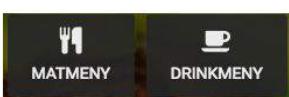
Folkungagatan 95 Hantverkargatan 80



+46 8 643 97 88  
+46 8 653 30 80



✉ info@restauranggandhi.se  
facebook.com/Restaurang-  
Gandhi-870923546268350/



Laxmi är den enda indisk restaurangen i Västerås som erbjuder välsmakande upplevelser, hälsosam och nyttig indisk mat, med härliga färskar råvaror och kryddat på äkta indiskt vis.

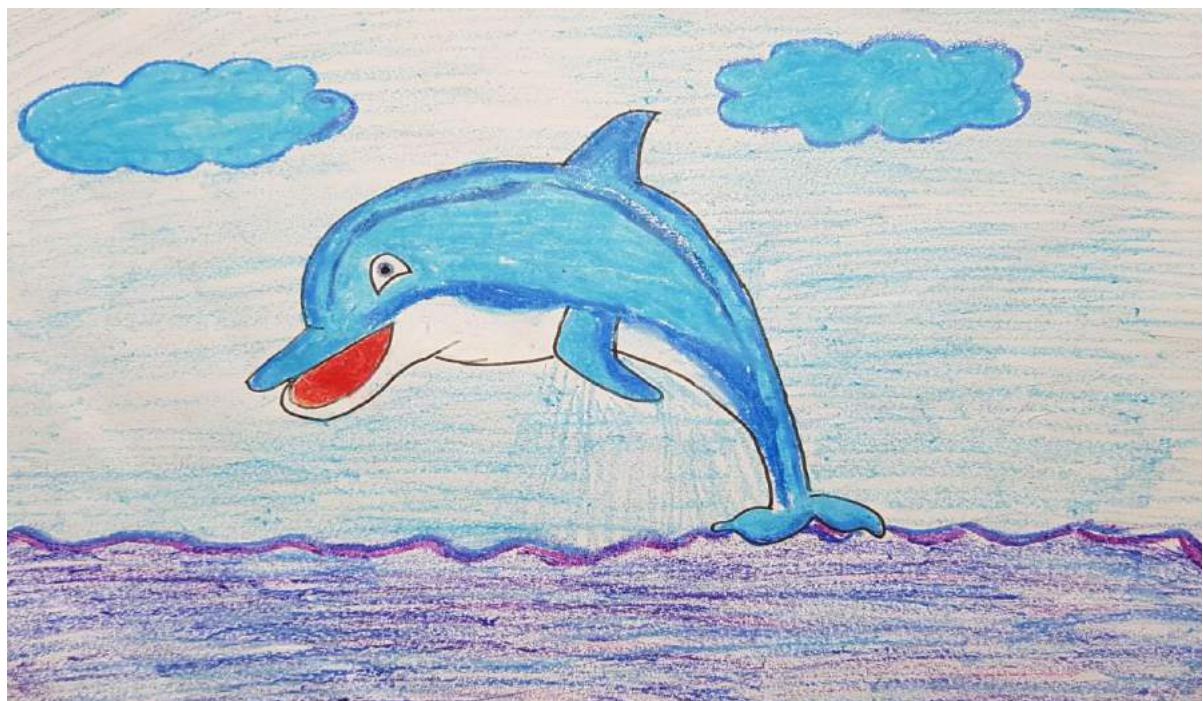


Laxmi Indisk Restaurang AB Snickaregatan 1  
722 13 Västerås 4578 Marmorå.

TELEFON :  
021-80 11 90



Drawing : Enakshee Chatterjee ( 5 years )



Drawing : Eeshanee Chatterjee (10 years)

## #8 Daisy's Bird

My bird fly and tweet  
She can swim & sing  
My bird is pretty and neat  
elegant & sweet.



Drawing & rhyme by  
Ansruna Dutta, Daisy (9 years)

ব

**STOCKHOLM**  
**BANGLA MOVIES**  
আ মরি বাংলা ভাষা!

শারদ  
শুভেচ্ছা

A non-profit initiative to promote Bengali Movies in Sweden

0764307366



# শুভ শারদীয়া Cardamom

শুভ শারদীয়া

INDIAN RESTAURANT

fine dining restaurant,  
offering Indian cuisine and warm hospitality  
in the heart of Stockholm city.



Luntmakargatan 42,  
Stockholm,  
111 37 Sweden.

Tel : +46 822 17 20  
Email : [info@cardamom.se](mailto:info@cardamom.se)

Stinsen  
**Hälsötek**

Stinsen i Häggen  
(Mitt emot City Gross kassor)  
Tel. 070-415 11 29



MÄRSTA HÄLSOBUTIK

Märsta Centrum • Tel. 591 154 50



# INDIA LORD



# INDIA LORD



শুভ শারদীয়া



Hantverkargatan 65,  
112 31 Stockholm

Telefon: 08 - 653 25 53

E-Post: info@indialord.se

Opens 7 days



G H Konsult KB

OUR EXPERIENCE YOUR SECURITY



### Våra Tjänster:

- ✓ Lopande Bokföring
- ✓ Bokslut
- ✓ Årsredovisningar
- ✓ Löner
- ✓ Fakturering
- ✓ Moms
- ✓ Deklarationer
- ✓ Övriga ekonomitjänster och administration



### Starta eget:

Är du i begrepp att starta din egen verksamhet hjälper vi dig med att registrera ditt bolag, ansöka om F & FA-skatt, kassaregister samt att momsregistrera verksamheten etc.

### Kontakta oss:

Mobil: +46 (0) 709 299 123  
E-post: ghkonsultkb@gmail.com  
Hemsida: www.ghkonsult.com

### Besök oss:

Guha Haninge Konsult KB  
Stora Björnens Gata -28  
SE-136 64 Haninge

For any information:  
[info@cubane.se](mailto:info@cubane.se)



Send your CVs to  
[careers@cubane.se](mailtocareers@cubane.se)

May the divine blessings  
of the goddess be with you on  
Ashtami and always!  
Wish You A  
Happy Durga Puja

**..take IT easy  
This Durga Puja**



Business Center City , Klarabergsgatan 29, Stockholm



Denmark Branch, Skodsborgvej 234, Copenhagen

শারদীয়ার  
প্রতি ও শুভেচ্ছা

India Dream

INDISK RESTAURANG & BAR

শারদীয়ার  
প্রতি ও শুভেচ্ছা

#### Festmöjligheter

Njut av Indisk mat i fräsch miljö  
Boka upp till 100 personer  
Ring för pris 08-6800006.

#### Öppettider

Mån - Fre 11:00 - 22:00  
Lör - Sön 12:00 - 22:00  
Lunch mån - fre 11:00 - 14:30

#### Ombyggnad

Vi har byggt ut!  
Nya delen har plats för 100 personer  
Varmt välkomna!

Du är välkommen att kontakta oss med bordsbokning, beställning  
eller bara för att ställa ett par frågor.



Epost: [info@indiadream.se](mailto:info@indiadream.se)



Tel: 08 - 680 00 06



Jägerhorns väg 1, 141 75 Kungens Kurva



## চিংড়ি বিরিয়ানি

### মিতা সাহা



ছানার মালাইকারি  
বাণী সিংহ

#### উপকরণঃ

চাল-	২৫০ গ্রাম	১ লিটার দুধের ছানা
চিংড়ি-	৫০০ গ্রাম	৪ টা ছোট এলাচ
দারচিনি-	৫-৬ টুকরো	৪ টা লবঙ্গ
এলাচ-	৪-৫ টা	২-৩ টুকরো দারচিনি
লবঙ্গ-	৫-৬ টা	২ টা তেজপাতা
শাহীজিরা-	১চা চামচ	২-৩ টা কাঁচা লক্ষা
কারি পাতা-	৮-১০ টা	২-৩ চামচ আদাবাটা
কাঁচামরিচ-	৩-৪ টা	ছোট ১ কাপ দই
আদা বাটা-	১চা চামচ	১ মালা নারকেল কোরা
রসুন বাটা-	১-১/২ চা চামচ	১/২ চামচ হলুদ
ধনে বাটা-	১চা চামচ	লবন স্বাদ মতো
মরিচ গুঁড়া-	১/২ চা চামচ	১ চামচ ঘি
টক দই-	১/২ কাপ	৮-৫ চামচ তেল
বিরিয়ানি মসলা-	১চা চামচ	২-৩ চামচ চিনি
পেঁয়াজ বেরেস্তা-	১ কাপ	
ধনে পাতা-	পরিমাণ মত	
লবণ-	স্বাদ মত	
কাজুবাদাম-	২চা চামচ (গুঁড়া)	
ঘি-	পরিমাণ মত	

#### রন্ধন প্রণালীঃ

প্রথমে চিংড়িকে আদাবাটা, রসুন বাটা, ধনে গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, লবণ দিয়ে মারিনেট করে ১০-১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে।

এরপর একটি পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, শাহীজিরা, কারি পাতা, লবণ দিয়ে জল ফুটাতে হবে। তারপর তার মধ্যে চাল দিয়ে দিতে হবে। চাল ৮০% ফুটে গোলে জল ঝারিয়ে রেখে দিতে হবে।

এরপর, কড়াইয়ে তেল দিয়ে মধ্যম আঁচে গরম করতে হবে। তেল গরম হলে অল্প অল্প করে চিংড়ি দিয়ে ভেঁজে উঠিয়ে রাখতে হবে।

এবার চিংড়ি ভাঁজা তেলে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ দিয়ে তাতে এক এক করে টক দই, কাঁচামরিচ, বিরিয়ানি মসলা, ধনে পাতা, লবণ দিয়ে কষিয়ে নিতে হবে। এরপর এই কষানো মসলাতে ভাঁজা চিংড়ি, বেরেস্তা, কাজুবাদাম গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে মৃদু আঁচে ঢেকে ৫ মিনিট রাখতে হবে।

এরপর, বড় একটি পাত্রে চিংড়ি ঢেলে তার উপর ফুটানো চাল দিয়ে ঘি, বেরেস্তা, ছড়িয়ে দিয়ে ২০ মিনিট পাত্রের মুখ আটকে দমে রেখে দিতে হবে।

২০ মিনিট পর হালকা হাতে মিশিয়ে বেরেস্তা উপরে ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করুন গরম মজাদার চিংড়ি বিরিয়ানি।।



#### রন্ধন প্রণালীঃ

প্রথমে ছানা কাটিয়ে একটা ভারী জিনিস চাপা দিয়ে জল ঝারিয়ে নিতে হবে। গরম ছানা থেকে জল ঝারতে দিলে ভালো হয়। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেঁকে একটা পাত্রে এক লিটার জল ঐ ছানার ওপর চাপিয়ে দিলেও জল ঝেরিয়ে যাবে। তার পর ছানাটা টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে।

কড়াই তে ৪-৫ চামচ তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে ছানার টুকরো গুলো বাদামি করে ভেজে তুলে নিতে হবে। এ তেলে এলাচ-লবঙ্গ-দারচিনি আধ ভাঙ্গ করে, তেজ পাতা আর লক্ষা দিতে হবে। ১-২ মিনিট পর আদা দিতে হবে।

মশলাটা একটু নাড়াচাড়া করার পর দই ভালো করে ফেচিয়ে ঢেলে দিতে হবে। অল্প হলুদ, লবন, চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নারকেল বাটা দিয়ে আরো একটু নাড়াচাড়া করতে হবে।

পরিমাণ মতো জল দিয়ে ফোটানোর পর ছানার টুকরো গুলো কড়াই তে দিতে হবে।

২-৩ মিনিট পর নামানোর সময় দুচামচ ঘি আর কিসমিস দিতে হবে।।



আগমনী  
নমিতা সেন শর্মা

শরতের আগমনী  
অঞ্জলি সেনগুপ্ত

শরতের আকাশটা নীল শুধু নীল,  
মাঝে মাঝে সাদা মেঘ হাসে খিলখিল।  
শেফালী ফুলের আর কমলের ডাক,  
পূজা উৎসব ঘিরে বাজবে যে ঢাক।  
এই হল শ্রীরামের অকাল বোধন,  
আশ্চর্ণে পূজা হয় তাই তো এখন।  
বছরে দুবার হয় দুই নাম লয়ে,  
বাসন্তী-দুর্গা আসে এই নাম বয়ে।  
দিকে দিকে বন্দনা আগমনী গান,  
শরতের আকাশেতে ভরে মন প্রাণ।  
পুষ্প হতে চারি দিকে সুগন্ধ ছড়ায়,  
এহেন পরিবেশে মন পুলকিত হয়।  
কুমোরোরা মাটি দিয়ে মূর্তি যে গড়ে,  
কচিকাঁচা ছুটে যায় দেখিবার তরে।  
ধূপ ধূনা, ঘটা ও ঢাকের আওয়াজ,  
আনন্দ করে সবে ফেলে রেখে কাজ।  
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও শেষ,  
দশমীর বিজয়তে ভাষানের বেশ।  
সিঁহুর, মিঠি, পান লয়ে বধু যায়,  
প্রণাম করিনু মাগো ঐ দুটি পায়।  
ঢাকে কাঠি বেজে উঠে বিদায়ের ক্ষণ,  
আকুলিত নরনারী বিষণ্ণ বদন।

শরৎ এসেছে নিয়ে সোনালী রোদের ছটা  
মুছে দিয়ে বরষার কালো মেঘের ঘটা  
নীল আকাশে সাদা মেঘ নানান রূপে ভাসে,  
চাঁদ মালা হয়ে সারি সারি হাঁস উড়ে আসে।  
ফুলে ফলে ভরে ওঠে প্রকৃতির চারপাশ।  
ধান খেতে ঢেউ তোলে মধুর বাতাস।  
রাশি রাশি শিউলি বার বার বারে,  
হাওয়ায় দোল খায় কাশ ফুল ঝিলের ওপারে।  
স্ত্রে জলে ফোটে কত পদ্ম ফুল,  
বাঁকে বাঁকে মধু লোভে আসে অলিকুল।  
দুর্গা মায়ের আগমনী গান  
বিমোহিত করে মন প্রাণ।  
নতুন সাজে মাতলো সবাই কাজে।  
মধুর সুরে সানাই ওঠে বেজে।  
” ঢ্যাম কুড়-কুড় ঢাক”- ঢাকিবা বাঁজায় ঢাক,  
সঙ্গে তাদের বেজে চলে কাঁসর, ঘটা, শাখ।  
উৎসবের উল্লাস-কলরবে মুখরিত পূজা প্রাঙ্গণ  
সমবেত উৎসাহে পূর্ণ হল মাতৃ-আরাধন।  
বিজয়া সম্মেলনে একে অপরকে করে আলিঙ্গন।  
মিষ্টি-মুখ করে, জানায় সাদর অভিনন্দন।  
প্রকাশিত হয় কত শারদ সাহিত্য সংকলন।  
তৃপ্ত করে নানা স্বাদে বাঙালী মন।  
ভোরের কুয়াশায় শরৎ তুমি মিলালে হায় হেমন্তের আকাশে।  
হিমেল বাতাসে তোমাকে বিদায় জানাই শিশির ভেজা ঘাসে।



#45553786



সেই সংগ্রাম ...  
শিল্পী চৌধুরী

সত্য আর সচেতনতার আবিরে -  
যেইদিন গুলো,  
বয়ে গেছে -প্রতিটি দিনের বারিধারায়...  
ক্লান্তি ভরা চোখের পলকে -  
যে স্বপ্নগুলো...  
হামাগুড়ি দিয়েছিল, অদম্য উদ্দীপনায় -  
সেই দিন, সেই সততার -  
আবিরে ঢাকা স্বপ্ন গুলো,  
অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে, স্থির হয়ে দাঁড়ালো -  
বলসানো সূর্যালোকের মতো...!!  
কান্না - হাসির নাগরদোলায় -  
এ ভাবে দুলছি আমরা,  
...দুলছে আমাদের সহ মানুষ রা ...!!  
হিংসায় নয়,  
শুধু ভালোবাসায় আর মানবতাই ...!!  
নীরব স্বপ্নগুলো -  
ফিরে আসে - আনন্দের কোলাহলে ..  
আমাদেরই কর্মের ধারায় ... "কর্ম ফল" হয়ে -  
...এভাবে চলছে -সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,  
চক্রাকারে...  
বদল করছি -আমরা, আমাদের স্থান..  
যেথায় শূন্য ...সেথায় পুণ্য ..!!!

বিশ্বাসে অপরাধ আছে  
রঞ্জিত চৌধুরী

জানতাম না বিশ্বাসে অপরাধ আছে  
নেতা বলেছিলেন, আজ থেকে মানুষের পরিচয়  
মানুষ নামেই, অন্য কিছু নেই।

পিতামহ সেই বিশ্বাসের স্নোত ধরে  
আম্ভৃত্য জড়িয়ে ছিলেন নিজস্ব মাটি।

তারপর কতকাল, সমুদ্র গর্ভজাত স্বপ্নভঙ্গের পর  
প্রত্যুষের বাস্তবতায় পড়ে রাইল  
দীনহীন উচ্ছিষ্ট ছিন্নমূল  
অপাঙ্গভৈরব বিধর্মী মানুষ  
যার মাটি পরবাস হয়ে গেছে কবে!

কবে কোন এক আবেগসংজ্ঞাত মায়াবী বাসরে  
কথা দিয়েছিল আফসানা গভীর নির্ভয়ে  
পাশে পাশে চলে যাবে সারাটি জীবন  
তারপর দিন মাস বছরের হাত ধরে  
কল্পনার জাল ছিঁড়ে বাস্তবের রাত্তি সত্য নিভে গেলে  
দেখলাম, আফসানা পিছে থেমে গেছে কবে  
সে আজ ময়ূরপঞ্জী চড়ে উড়ে গেছে  
বেশ আছে সূর্যমাত দেশে  
জানতাম না বিশ্বাসে অপরাধ আছে।





বিজ্ঞানের প্রতি সাহিত্যের চিঠি  
সংজীব দাস

সত্য রতন জ্ঞানে দৃষ্টি, হে স্মৃত্য জ্ঞান,  
যুগে যুগে আলোরে করিয়াছ আহ্বান ।

দূর কে করেছ নিকট শক্রের বন্ধু,  
পরাণ্ত করেছ যত অজ্ঞান - শকন্তু ।

সত্যরে স্বতঃফূর্তে করিলা যে উজাড় -  
সেই সত্য নিত্যতায় দিনু উপহার ।

দৃঢ় হস্তে ধরিয়া নব সত্যের রাশ,  
সত্য মাঝে সন্ধিগু সুন্দরের প্রকাশ ।

কত তত্ত্ব কত জ্ঞান করিয়া বর্ণন,  
মম মাঝে ঘটে তাহার অনুরনন ।

বিশাল জনসিদ্ধুর চেতনা সমক্ষে ...  
হত আজি জরাসিদ্ধু জ্ঞানের আলোকে ।

যারা ভাবে তোমারে অপর মম হতে  
চল যাই লয়ে তাদের 'মোদের' রথে ॥  
(হন্দযুক্ত সন্দেশ)

চিরন্তনের ধারায়...  
শিল্পী চৌধুরী

রাতের শেষে দিন  
দিনের শেষে রাত,  
সবই যেন - একসাথে  
মিশে একাকার ...!!  
রাত বলে,  
আমি আছি - অনেক তারার ভিড়ে ...  
...হাজারো নিরবতায় -  
দিন বলে,  
আছি তো আমি, দিবানিশি -  
শত সংগ্রামের ভিড়ে...!!!  
নয়তো কেউ - মূল্যহীন,  
জীবন হাটের - এই দরে ..!  
রাত ছাড়া যে, দিন নয় -  
নয় তো দিন, পৃণ্য - রাতের গভীরতা ছাড়া..!!  
এই ভাবে আছি -  
তুমি -আমি, আমরা - তোমরা  
একে- অন্যের ভিড়ে...  
সাম্যতা - সমরোতা - সহমর্মিতার আড়ালে ...!  
লুকোচুরির এ খেলা, চলছে -  
অনন্তকাল - চিরন্তনের ধারা





দূগগা দূগগা.....  
শুভজিত চন্দ্ৰ

আমার মা নাকি বাবার সাথে খুব ঝাগড়া করে,  
গরিবের সংসার, ছেলেপুলের সংসার।  
বেরেস্ত দাদু বলতো মা কে, ও মেয়ের অনেক দাপাদাপি,  
কিন্তু আমার মা আমাদেরকে বড় ভালবাসতো॥

কত্তকিছু রাজ্ঞা করে খাওয়াতো, নিজে কি খেত কে জানে?  
যখন লোকটা, আরে ওই বাজে লোকটা...।  
সবাইকে উচাটন করতে লাগলো।  
সবাই মিলে মা কে পাঠালো ওর কাছে॥

লোকটা মা কে চেয়েছিল।  
বাবা ত তখন গাঁজার নেশায় বিভোর।  
ওরা সবাই মা কে বলল, ভয় নেই, আমরাও আছি।  
বলে যে যা পারল মা কে দিয়ে দিল।  
বাটি, কাটারি, দা, রশি, লাঠি,  
মা কে সাজালো দামি শাড়ি গয়না দিয়ে॥

মা একলা মেয়ে, গেল লোকটার কাছে॥  
লোকটা যে কি করেছিল জানি না,  
ভাগিয়স মা লোকটাকে মেরে ফেলেছিল।  
ভাগিয়স আমার মার কিছু হয়নি॥

আমি দেখেছি চুপি চুপি মার কাঙ্গা।  
আমি দেখেছি বাবার ভোলা মনের উদাসীনতা।  
মার যে খুব কষ্ট হয়েছিলো॥

এখন ও কষ্ট হয় জানো, মার সেই কাঙ্গাটা মনে পড়লে।  
ওরা মাকে জোর করে লোকটার কাছে পাঠিয়েছিলো॥

মানুষ না হবার প্রার্থনা  
রঞ্জিত চৌধুরী

কথাটা তোমরা মানবে না  
বলছি, বিশ্বাস করো  
জন্মের অনেক অনেক আগে  
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা রেখেছিলাম  
হে ঈশ্বর আমায় মানুষ করো না।

হ্যাঁ আমি জানতাম  
মানুষ নামক জীবটির মাথায়  
দুকিয়ে দেবে বীভৎস এক যন্ত্র,  
বিবেক ঘর।

যে কুরে কুরে প্রাস করবে আমৃতু  
সমস্ত সুখের অণু-পরমাণু

আরো জানতাম  
ঐ বিবেক ঘরটির পাশেই থাকবে  
বুদ্ধিম  
প্রচণ্ড তাপদাহ অগ্নিকুণ্ড বুদ্ধিম থেকে  
জন্ম দেবে থোকা থোকা লোভ, হিংসা ও পাপ  
যা ধৰংসের প্রলয়ন্ত্রের  
মুদ্রা হয়ে পৃথিবী কাঁপাবে

আদৌ তার থেকে  
মঙ্গলের জন্ম হতেই পারে না  
মঙ্গল ও শান্তির, বুদ্ধির কীই বা প্রয়োজন  
দেখোনা কি নীরব নিষ্ঠেজ পশুরা শান্তিবাদী হবার ছল করে

হে ঈশ্বর একটি শিশুও একদিন  
এটমৰোমার চাবিকে ছুসনি বানিয়ে ভাববে  
এতো শীতল লাগে কেন !

হেরে যাওয়ার মন্ততায়  
দাবার গুটি উল্টে দেওয়ার জিঘাংসায়  
জানতাম, একবার মানুষ বানাবার ছলে  
জঘন্যতম হিংস্র পশুতে রূপান্তরিত করবেই তাকে  
হে ঈশ্বর তোমার খেলা ভালো করেই জানতাম  
জানতাম বলেই, কায়মনোবাক্যে মানুষ না হবার  
প্রার্থনা করে এসেছি অনাদিকাল।



## দুটি না বলা কথা শর্মি চক্ৰবৰ্তী

কানে কানে ফিসফিসিয়ে বললে, ‘ছিপছিপানো সবুজ বৰণ ভাল।  
চোখ টানে।’

শেখালে খিলখিল করে হাসতে।

চোখে চোখ রেখে বললে, ‘কাজল কালো।  
মন টানে।’

শেখালে নজর কাঢ়তে।

ঠোঁটে আঙুল রেখে বললে,  
‘কলি কলি, বৃষ্টিভোজা বুনো আলো,  
মাতন আনে।’

শেখালে নিজেকে ভালবাসতে।

শেখায় নি শুধু কথার পিঠে  
‘আনি-মানি-জানি না’ কইতে।  
হয়তো জানা ছিলো না নিজে-ও,  
পারেনি তাই শেখাতে।

এসেছিলো ‘বিদায়’ জানাতে।  
চোখ ভিজলো, থরোথরো মন চাইলো কেবল ‘দুটি’ কথা বলতে।  
‘দেবোনা যেতে’।  
পারলো কি বলতে ?  
হারিয়ে গেলো রূপকথা।  
কাজল কাজল মন ভাঙানো,  
বাদলা দিনের মেঘ মাখানো,  
আরশিতে।

## বাসনা কামনা শিবেন্দু দেব

বাসনা কামনা সহোদরা বোন দুই ওরা  
জাগায় অন্তরে অফুরন্ত চিন্তার  
কত যে ফলশু ধারা।  
দুঃখ পীড়েন্নের জন্ম দাত্রী তারা  
করে আমায় অবিৱাম দিশাহারা।  
জীবন তরণী মোৰ তাই  
এই সংসার সমুদ্র পারাবারে  
দুলে দুলে চলে, হয়ে গন্তব্যহারা।  
প্রাণ মনে বেঁধে বাসা  
করে আমায় নিয়ে অহৰ নিশি  
আশা নিৱাশার কতই না খেলা  
হদি মাৰো তুলে অজন্তু  
উত্তাল তৰঙ্গ মালা।  
পঞ্চ ভূতেৰ ক্ষুদ্র দুর্বল  
দেহ কুটিৰ হয়েছে যে আজ  
ওদেৱই রংমঞ্চ শালা।  
ক্ষীন ইচ্ছা শক্তি মোৰ তাই  
পারে না কৰতে সংযত  
বসাতে ওদেৱ শৃংখলা  
আৱ নিয়মেৰ পাঠশালা।  
পরিত্বষ্ণি না পেলে তাদেৱ রসনা  
শান্তি কি শুধুই দুৱাশা শুধুই কল্পনা।

♩ = 60 Slow

Ā-mār hā-jar ba-sā-nā kō - - - mā-nā kā-re-cho bīdhā-tā chur - - - nā  
 Ā mār dhā rū-jē tū bā pā clō tā le ā sīm āmār pur - - - nā



## প্রতীক্ষা শিবেন্দু দেব

আমিতো সেই চির অপেক্ষমান অতিথি তোমার  
বিনিন্দ দাঁড়িয়ে বদ্ধ দ্বার পরে ।  
আছি দোয়ার খোলার প্রহর গুনে  
প্রভাত কিরণ মাঝে ডাকবে ঘরে  
জড়াবে আমায় হাদি মাঝে গভীর আলিঙ্গনে ।  
তুমি আমি মিলে মিশে এক হব যে  
ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে ।  
বাধার প্রাচীর যায় যাদি খসে  
পারবো নাকি আবার আমি নিজেকে তখন জানতে  
আপনারে চিনে নিতে এই দুই নীল নয়নে ।  
মিলনের মধুর রসে উঠবো কি জেগে  
এতকাল যা ছিল ডাকা আঁধারের অবঙ্গনে ॥

## সন্তান মৌমিতা ঘোষ

তোর হাত ধরে পাব আমি মাতৃত্বের আস্থাদ!  
তোর অপেক্ষায় আছি আমি কত রজনী কত সকাল!!  
মা নামে ডাকবি আমায়, আশাইয় আছি তার!  
মিষ্টি ডাকে নয়ন আমার ভরবে বার বার!!  
সকাল বিকাল দুষ্টুমি আর অনেক অনেক আদর!  
আলো করে থাকিস তুই মায়ের এই স্বপনের ঘর!!  
তোর স্পর্শের কোমল হোঁয়ায় ধন্য হোব আমি!  
প্রথম দেখার মুহূর্তটা সব চেয়ে হবে দামি!!  
সবার আশিস মাখায় নিয়ে হোক জীবন সমন্দে পড়ি!  
সদা ঈশ্বর তোর সহায় থাকুক এই প্রার্থনাই করিব!!

## পাহাড় চূড়ায় মধুমিতা আচায়

পাহাড় চূড়ায়	আবীর ছড়ায়
রডোডেন্ড্রন গুচ্ছ ।	
আলতাপরী	বেড়ায় উড়ি
নঞ্চিয়ে তার পুচ্ছ ।	
আমের বোলে	হাওয়ায় দোলে
ভংরমর আজি দিল খোলা,	
মলয় পৰন	মৃদু সমীরণ
মংগদার ফুলে দেয় দোলা ॥	

## বাসন্তিকা মধুরিমা সরকার

রডোডেন্ড্রন গাছে গাছে  
পাখীরা আনন্দে নাচে  
প্রিমুলা ফুলে মৌমাছি দোলে  
লাচুং নদীর কাছে ।

রডোডেন্ড্রন রাঙায় ডালি -  
আগুন রঙা সাঁজে,  
প্রজাপতিরা নাচছে দেখো  
রুনোফুলের কাছে ॥





## অতৃপ্তি প্রেম

### স্বপন চট্টোপাধ্যায়

পাখীর ডাকে ঘুম ভাঙ্গে -

শেষ রাতের স্বপ্নের রেশ মলিন হওয়ার এখনো সুযোগ আসেনি ॥

স্বপ্নের সেই মানসীর কোমল সুরের অনুরণন এখনো মনটাকে তরতাজা করে রাখে -

প্রশ্ন করি ; তুমি কি শুধুই স্বপ্নের মানসী, না আমার বাস্তবের সেই হারিয়ে ফেলা কেউ ?

রৌদ্রক্ষরা দুপুরে তোমার অপেক্ষায় গাছতলায় মুহূর্ত গোনা - নিজেকে ব্যস্ত করে তোলা অন্যদের না দেখার অচিলায় -  
তোমার হাতে হাত রাখার দুর্দম ইচ্ছেতে তোমার সেই ঠাণ্ডা উক্তি "এই, কি হচ্ছে কি, লোকে দেখে ফেলবে না" ।

নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে দুজনে এক গাছতলার শূন্যস্থান পূর্ণ করি লোক চক্ষুর আড়ালে ।

তুমি কলকলানিতে কত কি বলে যাও - তোমার বান্ধবীদের কথা, তোমার অনুজের কথা -

অধীর অপেক্ষায় থাকি তোমার মুখের দুটো ভালবাসার কথাটু ॥

তুমি ব্যস্ত হয়ে পর ঘরে ফেরার - ওঠার মুখে গুঁজে দাও তোমার লেখা কয়েক লাইন

ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠো "এবার কিন্তু বড় করে লিখবে" ।

তোমাকে দেখার উদ্দেশ্যে আজও দাঁড়িয়ে থাকি -

ইতি উতি চাই তোমার তথী শরীরে জড়ানো এক উজ্জল শাঢ়ির ঝালকের অপেক্ষায় -

মনে হয় এ অপেক্ষায় অন্তহীন -

তোমারি এক বান্ধবী এগিয়ে আসে - বিনয়ের সাথে জানায় তুমি আর কোনদিনও আসবে না -

তুমি সম্পর্কের ইতি টেনেছ অন্য এক ভালো লাগার অচিলায় ।

মুঠোয় ধরা কাগজটা হাতের ঘামে ভিজতে থাকে - তোমাকে লেখা আমার অনুভূতি আজ শুধুই এক কাগজ ।

যন্ত্রনায় আমি কিকিয়ে উঠি - চিৎকার করে জানতে ইচ্ছে করে তুমি কি তাহলে আমার ভোরেরই স্বপ্ন - বাস্তবে যার কোনো অস্তিত্ব নেই,

আছে শুধু এক হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি ॥



Best thing to happen for Indians in Sweden, 2017  
-Agneev Guin



## ফেসবুক - দৃশ্য, অদৃশ্য বিপ্লব সান্যাল

### দৃশ্য

সোফায় আধশোয়া অনির্বাণ, ডেক্টপে ফেসবুকে সঞ্চারীর পোষ্ট। পাশে মোবাইল হাতে শ্রী সঞ্চারী।

অনির্বাণ টাইপ করেং I am so proud of you. You are my most precious possession. I can't live without you.

সঞ্চারীর উত্তরঃ I love you to the moon and back.

সঞ্চারী সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায়, ভুরু কুঁচকে বলেং: রিমির ছবিতে লাভ দেওয়াটা কিন্তু বাড়াবাড়ি।

অনির্বাণঃ আর তুমি যে তোমার মার কবিতা হাজারবার শেয়ার করো... ওগুলো কবিতা ?

সঞ্চারীর চোখ ভিজে, গলা বাঁকালোং: আবার মা কে অপমান ? তুমি এত ইতর জানলে তোমাকে ...

অনির্বাণঃ যাও যাও, আমাকে বিয়ে করে জাতে উঠেছ, ভুলে যেও না ...

একটা দমকা বাতাস আসে, জানলার পর্দা খসে পড়ে, বাইরে কারখানার কুৎসিত কালো ধোঁয়া লকলক করে গিলে ফেলছে শরতের নীল আকাশ।

### অদৃশ্য

রোজকার অভ্যেসমত ঘুমজড়ানো চোখে অভিজিত বালিশের পাশে রাখা আইপ্যাডে ফেসবুকের পাতা ওলটায়, থমকে যায় একটা পোষ্টে।

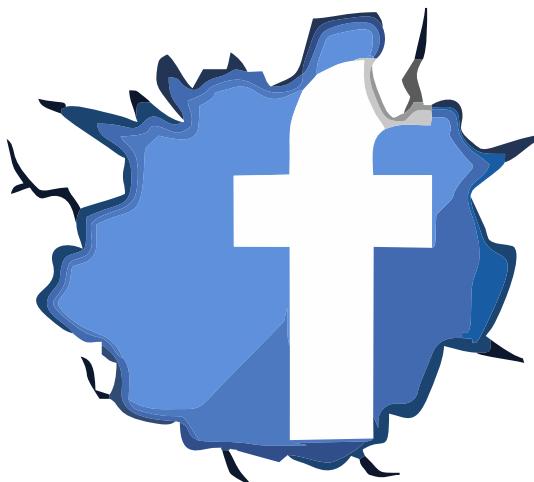
“সুচেতনা, তুই যেখানেই থাকিস, খুব ভালো থাকিস, তুই স্বার্থপরের মত আমাদের ছেড়ে এইভাবে চলে গোলি...”

সুচেতনা মাস হয়েক আগে অভিজিতকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল। অজানা মেয়ে, আবার অল্পবয়সী, অভিজিত অনেক ইতস্তত করে সেটা নিয়ে নেয় মিউচুয়াল ফ্রেন্ড থাকায়। মাঝে মধ্যেই সুচেতনার সেলফি, পোস্ট ইত্যাদি চোখে পড়ত, আরও শয়ে শয়ে পোস্ট যেভাবে স্নোতের মত আসে যায়, একটা দৈনন্দিন জীবনের মত। কোনদিন আলাদা করে পরিচয় হয়নি।

সুচেতনা সুইসাইড করেছে, কত মানুষই তো প্রতিদিন পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ...।

তবু অভিজিত একটা শূন্যতা অনুভব করে, মনে হয় হঠাতে গিলোটিনের একটা আঘাতে জীবন আর মৃত্যু আলাদা হয়ে যায়।

একটা শূন্য দৃষ্টি নিয়ে অভিজিত সুচেতনার প্রোফাইল ছবির দিকে চেয়ে থাকে, ভাবতে অবাক লাগে ফেসবুকের এই পেজটা হয়ত রয়ে যাবে আরও অনেক দিন সেই অচেনা অজানা উচ্চল প্রাণের স্পর্শ ছাড়া।





## কুট যুদ্ধে বাঙালী সুমিত বর্ধন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করল ১ অগস্ট ১৯১৪, আর তার দুদিন পরেই, ৩ অগস্ট, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। প্রত্যুভাবে ব্রিটেনও জার্মানীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষনা করল। তুর্কী জার্মানীর সঙ্গ চুক্তিবদ্ধ ছিল, ২৯ অক্টোবর তুর্কির যুদ্ধ জাহাজ রাশিয়ার অডেসা, সেবাস্টোপল, নভোরসিস্ক আর ফেওডেসিয়া বন্দর আক্রমণ করল। ৫ নভেম্বরের মধ্যে ফ্রান্স আর ব্রিটেনও তুর্কীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দফায় দফায় ভারত থেকে দফায় দফায় মোট ১৩ লাখের ওপর সৈন্য বিদেশ লড়তে যায়। এর মধ্য পৌনে সাত লাখকে পাঠানো হয় মেসোপটেমিয়ায়। ২৩ অক্টোবর ১৯১৪ মেসোপটেমিয়া বা আজকের ইরাকে পৌছয় ইঞ্জিয়ান এক্সপিডিশনরি ফোর্স ডি'র প্রথম সৈন্যদলটি। ৯ এপ্রিল তৎকালীন সেনাধক্ষ জেনারেল ব্যারেটের থেকে দায়িত্ব বুঝে নিলেন জেনারেল জন নিউন, তাঁর ফৌজে যোগ দিল আরো সেনাদল। নিউনের নিচে আরো দুই সেনাধক্ষ্য - ৬ নং পুনা ডিভিশনের দায়িত্ব মেজর জেনারেল মেলিস, আর ১২ নং ডিভিশনের মাথায় মেজর জেনারেল গরিঞ্জ। মেসোপটেমিয়া নিয়ে লঙ্ঘনের ওয়ার অফিসের তত চিন্তা ছিল না, তাদের কাছে ইউরোপের লড়াইটা ছিল প্রধান। কিন্তু প্রাচ্যের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বহু প্রজা মুসলমান, সুতরাং মুসলমান দেশ তুর্কী লড়াইতে জড়িয়ে পড়াটা ভারতের ভাইসরয়ের কাছে কিঞ্চিং মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়াল। প্রজাদের সাম্রাজ্যের পরাক্রম দেখাতে প্রয়োজন হয়ে পড়ল একটা চোখ ধাঁধানো বিজয়ের। লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য তাই হয়ে দাঁড়ালো বাগদাদের দখল নেওয়া। ফৌজকে দায়িত্ব দেওয়া হল বসরা থেকে কর্ণা, আমারা, নাসিরিয়া হয়ে ক্রমে কুট-আল-আমারা পৌঁছনোর। কুটের পর সিধে রাস্তা চলে গেছে টেসিফন অবধি, আর তার পরেই বাগদাদ। এই ফৌজে ভারতের নানান প্রান্তের সেনা থাকলেও, বাঙালীদের কোন স্বতন্ত্র সেনা দল ছিল না। শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোর।

কুটের যুদ্ধের কথা বলার আগে এই দলটির ইতিহাস একটু জেনে নেওয়া দরকার। ১৯১৪ সালের ১৪ অগস্ট অনেক রাজা মহারাজা মিলে টাউন হলে একটা সভা করে যুক্ত ইংল্যাঞ্জেকে নানা সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার একটি বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোর গড়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই কোরের ব্যয়ের দায়িত্ব ছিলো খানিকটা ইংরেজ সরকারের, আর বাকিটা এই কোরের উদ্যোগাদের। এইসব উদ্যোগাদের মধ্যে অন্যরা ছাড়াও ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ, ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোর একটা জাহাজে হাসপাতাল চালাবে। কিন্তু এই কাজের জন্যে কেনা জাহাজটা ১৯১৫ সালের ১৭ মে মধ্যপ্রাচ্য যাবার পথে মাদ্রাজের কাছে ডুবে যায়। এরপর বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোর আমারা শহরে একটা হাসপাতালে যুক্ত আহতদের চিকিৎসা দিতে আরম্ভ করে।

এইবার যুদ্ধের কথায় আসি। ২২ এপ্রিল ৬২ নং পুনা ডিভিশনের দায়িত্ব নিলেন জেনারেল টাউন্সেন্ডে। প্ল্যান মোতাবেক লড়াই করে ৩০০ জুন ছিনিয়ে নিলেন আমারা, ২৫ জুলাই অধিকার করলেন নাসিরিয়া। ২৮ সেপ্টেম্বর সারাদিন লড়াইয়ের পর তাঁর ফৌজ অধিকার করল কুট-আল-আমারা। কুট-আল-আমারা'র ৬৪ কি.মি. দূরে টেসিফন, আর তার মাত্র ২৬ কি.মি. দূরেই বাগদাদ। টেসিফনে তুর্কী ফৌজকে হারিয়ে দেওয়ার অর্থ একেবারে বাগদাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং কুট-আল-আমারা বিজয়ের পর বিলম্ব না করেই জেনারেল টাউন্সেন্ডের ফৌজ যাত্রা শুরু করল টেসিফনের দিকে। টাইগ্রিস নদী বরাবর মার্চ করে ভারতীয় ফৌজ ৫ অক্টোবর আজিজিয়া পৌঁছল। জেনারেল নিউন ভারতে টেলিগ্রাম করলেন যে তুর্কী ফৌজ পিছু হটছে।

১১ নভেম্বর শুরু হল বাগদাদ আক্রমণের প্রস্তুতি। জেনারেল টাউন্সেন্ড তার ফৌজকে আরো সামনে, কুটুনিয়া, জর, লাজ্জ এইসব জায়গায় সরিয়ে আনতে লাগলেন। এই টেসিফন থেকেই ভাগ্যের চাকা উল্টোদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল। ইংরেজ অফিসারারা ভাবতেন বরাবরের মত তুর্কী ফৌজ এখানেও পিছু হটবে, তাঁরা ক্রিসমাসটা বাগদাদেই পালন করবেন। কিন্তু সে হবার ছিল না।

২১ অক্টোবর জেনারেল টাউন্সেন্ড ফৌজকে তিন-চার ভাগে ভাগ করে ফেললেন। মেজর জেনারেল ডেলামেন নিলেন কলাম 'এ'র দায়িত্ব, কলাম 'বি' রইল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যামিল্টন দায়িত্বে, আর কলাম 'সি'র ভার নিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হ্যাটন। এছাড়াও মেজর জেনারেল মেলিসের দায়িত্বে রইল একটা বাড়তি কলাম।



আক্রমণের প্ল্যান খুব সোজা। প্রথমে কলাম ‘সি’ একটা প্রারম্ভিক আক্রমণ করবে। এরপর কলাম ‘বি’ আর মেজর জেনারেল মেলিসের বাড়তি কলাম একযোগ আক্রমণ করে মোড় ঘূরিয়ে দেবে। আর একদম শেষে কলাম ‘এ’ আক্রমণ করে তেজে দেবে শক্তির প্রতিরোধ।

২২ অক্টোবর সকাল সাতটায় শুরু হল আক্রমণ। কিন্তু টাউন্সহেণ্ড একটা ভুল করেছিলেন। তুর্কী ফৌজের পক্ষে পেছন থেকে প্রয়োজন মত অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে আসা সন্তুষ্ট ছিল। অন্যদিকে টাউন্সহেণ্ড কাছে কোন রিজার্ভ বা বাড়তি সৈন্যবল ছিল না। টেসিফন জয় করতে পারলেন না টাউন্সহেণ্ড। মারাত্তাক ক্ষয়ক্ষতি হল তাঁর ফৌজের। সৈন্য হতাহত হল চারহাজারের ওপর। তিনশো ইংরেজ অফিসারের মধ্যে হতাহত একশো তিরিশ, আড়াইশোর মতন ভারতীয় অফিসারের মধ্যে হতাহত একশোর ওপরে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ পাল্টা আক্রমণ করলেন তুর্কী কমাণ্ডার নুর-উদ্দিন-পাশা। আক্রমণ চললো পরের দিন অবধি।

২৫ অক্টোবর টাউন্সহেণ্ড হৃকুম দিলেন পিছু হটার। পেছনে সরতে সরতে ২ ডিসেম্বর ভোরবেলা কুট এসে পৌঁছল টাউন্সহেণ্ডের যুদ্ধবিদ্বন্ত ফৌজ। কুটে এসে টাউন্সহেণ্ডের ফৌজ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল।

১৫ ডিসেম্বর এসে পড়ল তুর্কী ফৌজ। সংখ্যায় তারা কম করে এগারো হাজার হবে। টাউন্সহেণ্ডের ফৌজকে তুর্কীদের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে বের করে আনতে জানুয়ারী মাসে লেফটেনান্ট জেনারেল এলমার হাজার বিশেক সৈন্যের একটা ফৌজ নিয়ে অনেকগুলো লড়াই করলেন। কিন্তু দু-দুটো যুদ্ধে তাঁর অনেক সৈন্য ক্ষয় হল, কুট অবধি তিনি পৌঁছতে পারলেন না।

এলমারের হারের পর নিম্ননের জায়গায় সুপ্রীম কমাণ্ডার হলেন পার্সি লেক। তিনি এলমারকে আরো সৈন্য সামন্ত পাঠালেন। এলমার তুর্কীদের আক্রমণ করলেন, কিন্তু চার হাজার সৈন্য খুইয়েও তিনি জিততে পারলেন না। মার্চ মাসে তাঁর জায়গায় আনা হল জেনারেল গরিঞ্জকে, কিন্তু তিনিও লড়াই জিততে পারলেন না টাউন্সহেণ্ডের ফৌজকে ছাড়াতে গিয়ে হতাহতের সংখ্যা তিরিশ হাজার ছাড়ালো।

অবশেষে ২৯ এপ্রিল টাউন্সহেণ্ড হালিল পাশার কাছে আত্মসর্পণ করলেন। প্রায় তেরো হাজার সৈন্য তুর্কীদের হাতে যুদ্ধবন্দী হল। এই হল কুটের যুদ্ধের পটভূমি। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষদৰ্শীর বিবরণ দুজন বাঙালীর কাছ থেকে পাওয়া যায়। প্রথমজন বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোরের সদস্য শিশিরপ্রসাদ সর্বাধিকারী। তিনি যুদ্ধের বিবরণ ডায়েরীতে লিখে রাখতেন। আত্মসমর্পণের পর তিনি বন্দী হন, এবং বন্দীদশায় বহু যত্নে ভোগ করেন। যুদ্ধ শেষ হলে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ‘আভি লে বাগদাদ’ নামে একটি বইতে প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় যে বাঙালীর বিবরণ পাওয়া যায়, তিনি হলেন ক্যাপ্টেন কল্যাণ মুখার্জী। ইনি অবশ্য ডাক্তার, বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোরের সদস্য নন। ক্যাপ্টেন মুখার্জীও তুর্কীদের হাতে বন্দী হন, এবং বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি কর্মরত অবস্থায় বাড়িতে যে চিঠি লিখতেন, সেগুলি একত্রিত করে তাঁর মাতামহী মোক্ষদা দেবী ‘কল্যাণ প্রদীপ’ নাম দিয়ে বই আকারে প্রকাশ করেন। কল্যাণ মুখার্জী ১৯০৬ সালে মেডিকেল সার্টিস পরীক্ষা দিয়ে মিলিটারি ডাক্তারের চাকরিতে নিযুক্ত হন। যুদ্ধ শুরু হবার পর কল্যাণ মুখার্জী ১৯১৫ সালের ১৩ এপ্রিল বসরা পৌঁছন, সেখান থেকে তাঁকে কয়েকদিন বাদে কুরনা পাঠানো হয়। আমরা ইংরেজদের হাতে আসার পর ক্যাপ্টেন মুখার্জী সেখানে যান, এবং আহতদের সঙ্গে করে আবার বসরায় ফেরৎ আসেন। সেখান থেকে যান নাসিরিয়া। নাসিরিয়া থেকে ফৌজের সঙ্গেই আরো দু-একটা জায়গা হয়ে কুট-এল-আমারা পৌঁছন। বলাই বাহুল্য তিনি এই যাত্রাটা বেড়াতে বেড়াতে করেননি, লড়াইয়ের গুলিগোলার মধ্যে দিয়ে মিলিটারি ডাক্তারের কর্তব্য পালন করতে করতেই কুট পৌঁছেছিলেন। কুটের পর ফৌজের সঙ্গে দিনে কুড়ি মাইল টানা মার্চ করতে করতে অক্টোবরের গোড়ার দিকে পৌঁছন আজিজিয়া।

এর পর ২২ অক্টোবর টেসিফনের যুদ্ধে। যুদ্ধের সময় আহতদের শুশ্রায় করতে করতে নিজেও ঘায়েল হলেন ক্যাপ্টেন মুখার্জী, তাঁর বাঁ হাতের কনুইতে গুলি লাগলো। লড়াইয়ের হারের পর টাউন্সহেণ্ডের ফৌজের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মুখার্জী আবার কুটে এসে পৌঁছলেন। কুট তখনে অবরুদ্ধ হয় নি, আহত কল্যাণ মুখার্জী চাইলে হয়ত আমারা ফেরত আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন। চিঠিতে নিজের মাকে লিখলেন ‘আমার হাতে যে গুলি লেগেছে সেই ওজর করে হয়ত “আমারা” পর্যন্ত ফিরে যেতে পারতাম – তা লজ্জা করতে লাগল। কত শক্ত শক্ত জখমি রইল – আমার তো নাম মাত্র জখম’।

টাউন্সহেণ্ড আত্মসমর্পণ করার পর বাকি ফৌজের সঙ্গে ক্যাপ্টেন মুখার্জীও বন্দী হন। বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোরের সদস্যরা ‘আমারা’র হাসপাতালে কাজ শুরু করেছিলেন। এখানে থাকলে তাঁদের হয়ত অতটা প্রাণের বুঁকি বা শারীরিক কষ্টের সন্তান ছিল না, কিন্তু তাঁরাও



‘খাচিল তাঁতী তাঁত বুনে’ প্রবাদের মান রেখে লড়াইয়ের জায়গায় যাবার জন্যে দরখাস্ত করলেন। যাঁরা যেতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে ছত্রিশজনকে বেছে নিয়ে কুটে পাঠানো হল। এই দলের ইনচার্জ ছিলেন হাবিলদার অমরেন্দ্র চম্পটি। ৩ অক্টোবর বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোরের এই সদস্যরা কুট পৌছলেন। কুট থেকে ফৌজের সঙ্গে এগোতে এগোতে বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোর পৌছল আজিজিয়া। সেখান থেকে ২১ অক্টোবর রাত নটায় রওনা দিল টেসিফনের উদ্দেশ্যে।

২২ অক্টোবর শুরু হল টেসিফনের লড়াই। শিশির সর্বাধিকারীর ভাষায়, “এখন কামানের বুমবুম ও রাইফেলের কড় কড় শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।”

২৩ অক্টোবর যুদ্ধ শেষে শিশির সর্বাধিকারী তার বীভৎসতা নিজের চোখে দেখলেন “কাঁটা তারে এখানে একটা হাত, ওখানে খালি পাটা ঝুলছে। একটা লোক তারে আটকে ঝুলছে, নাড়িভুংড়ি সব বেরিয়ে গেছে।” লড়াইয়ে হারের পর পিছু হটে বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোর বাকি ফৌজের সঙ্গে কুটে ২ ডিসেম্বর ফেরৎ এল। পথে মাথায় গুলি লেগে মারা গেলেন যতীন মুখাজ্জী। বেঙ্গল অ্যামুলেন্স কোরের যে ছত্রিশজন লড়াইয়ে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কাউকে টেসিফনের যুদ্ধের আগে, কাউকে বা তার পরে অসুস্থতার কারণে ফেরৎ পাঠানো হয়। কুটে হঠে আসার পথে ছজন তুর্কীদের হাতে বন্দী হন। শেষ পর্যন্ত কুটে রয়ে যান আঠেরোজন। অবরোধের সময় নানা কষ্ট সহ্য করার পর এঁরা তুর্কীদের হাতে বন্দী হন। এঁদের মধ্যে অসুস্থতার কারণে বিনোদ চ্যাটাজ্জীকে তুর্কীরা আত্মসমর্পণের পরেই ছেড়ে দিলেও বাকি সতেরোজনের ভাগ্যে লেখা ছিল সুন্দীর্ঘ বন্দীজীবন।

টাউপ্স্হেণ্ডেকে রাজার হালে রাখলেও, ফৌজের সৈন্যদের প্রতি তুর্কীরা বিশেষ মায়া-মমতা দেখায়নি, তাদের বন্দী অবস্থায় অনাহার, অসুস্থতা এবং নানা নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বন্দী অবস্থাতেই মৃত্যু বরণ করেন অমরেন্দ্র চম্পটি, প্রবেধ ঘোষ, সুশীল লাহা, ম্যাথিউ জেকব, শৈলেন বোস, প্রিয় রায় ও অমূল্য চ্যাটাজ্জী। বাকিরা কেউ ১৯১৬ সালে বন্দী প্রত্যার্পণের সময় এবং কেউ ১৯১৮ যুদ্ধে শেষের পর মৃত্যি পান। শেষোক্ত দলের মধ্যে ছিলেন শিশির সর্বাধিকারী।

গুলি লাগাকে ‘নামমাত্র জখম’ ভাবা বাঙালী ক্যাপ্টেন কল্যাণ মুখাজ্জীরও আর ফেরা হয় নি। বন্দীদশাতেই অসুস্থার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মিলিটারি ক্রস প্রদান করে।

লড়াইয়ে যে সমস্ত বাঙালী প্রাণ দেন তাঁদের বয়স খুব একটা বেশী ছিল না। শিশির সর্বাধিকারীর কথায় “প্রিয়, অমূল্য, শচীন, সুশীল ও যতীন এই কজনের বয়স যোগ করলে একশো হত না”।

কিন্তু বয়স অল্প হলেও আজকের বাঙালীর তুলনায় এই একশো বছর আগেকার বাঙালীরা সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া ছিলেন। তার অন্যতম উদাহরণ শিশির সর্বাধিকারী নিজে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও তিনি ফের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দিলেন। তিনি লিখছেন, “বয়স তখন পঞ্চাশের ওপর, সিভিলে ভাল পদেই অধিষ্ঠিত ছিলাম, লড়াইয়ে গেলে টাকা বেশি পাব, তাও নয়, তবুও গেলাম। ’৪২ সালের জুন মাসে আমি তখন IV Corps হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে ইম্ফলে। বর্মা থেকে রিফিউজিরা হাজারে হাজারে আসছে, জেনারেল আলেকজাঞ্জারের বাহিনী আর সেই সঙ্গে চীনে ফৌজও রিটায়ার করে আসছে, জাপানীরা মাঝে মাঝে বোমা ফেলছে। দিনরাত বৃষ্টি, তাঁবুর ভেতর বানের জলের মতো বৃষ্টির জল চলে যাচ্ছে, খাবার কষ্ট, থাকবার কষ্ট, মোটের ওপর জীবন যে খুব সুখের ছিল তা নয়। সবাই একটু মনমরা। এমন সময়ে এক ব্রিগেডিয়ার আমার বুকে প্রথম মহাযুদ্ধের তিনটি রিবন দেখে একটু ঠাট্টাছলে বলে উঠলেন ”By Jove, Major, as if one war was not enough for you!” একটু পরেই গন্তীর হয়ে বললেন 'I believe the spirit of adventure dies hard, and once a soldier, always a soldier!'" পরাধীন ভারতে এই প্রায় সহায়সম্বলহীন বাঙালীরা যে শুধুমাত্র নিজেদের সাহস আর বীরত্বের জোরে ইংরেজদের কাছ থেকে এই সম্মানটুকু আদায় করে নিতে পেরেছিলেন, তাঁর জন্যে এঁরা আজও আমাদের প্রণয়।

#### তথ্যখণ্ড

১। আভিলে বাগদাদ, শিশিরপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সম্পাদনা সনৎ নক্ষর।

২। কল্যাণ প্রদীপ, মোক্ষদা দেবী।

৩। Honour and Fidelity, India's Contribution to the Great War, Amarinder Singh





## মিক্কোর সঙ্গে একদিন

### সুনীল কুমার সিংহ

ঘুরে বেড়াতে আর কার না ভালো লাগে। আর জায়গা টা যদি বিদেশ হয় তবে তো বলার কিছুই থাকে না। ইন্দ্রনীল সুইডেনে যাবার কিছুদিন পরেই আমাদের বলল - একবার ঘুরে যাও। আমি বললাম মোটে একবার?

- না বাবা, একবার, আরো একবার, আরেকবার, আরো আরেকবার। তুমি যে সত্যজিৎ রায় এর ১২ টা করে গল্পের বই এর সিরিজ টা দিয়েছিলে না - সেটাৰ মত। তা হলে প্রথম একবার হয়ে যাক।

হয়ে গেল। আরলাভা পৌঁছলাম।

শনিবার - রবিবার ইন্দ্রনীল আর নেত্রা আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। সপ্তাহের বাকি কটা দিন আমরা দুজনে বেরোতাম। আমাদের দুজনের দুটো মাছলি পাস্ করে দিয়েছিল। আমাদের ভিসা ছিল নবই দিনের। কাজেই ঐ সময় যতটা সন্তুষ্ট ঘুরে বেরিয়ে নেবার ইচ্ছে।

সেদিন ঝর্ণা গোকুল পিঠে বানাবে, বলল - তুমি একাই যাও। খেয়ে দেয়ে বেলা এগারোটায় আমি একাই বেরোলাম। অধিকাংশ দিনই টুরিস্ট দের জন্য যে দ্রষ্টব্য জিনিসের লিস্ট আছে সেটা দেখে ঠিক হত কি দেখা হবে। আজ উদ্দেশ্যযৈহীন ভাবে ঘোরা। বাসস্ট্যাডে একটা বাসে চড়ে বসলাম। লাষ্ট স্টপেজে নামৰ তারপর হেটে যতদূর ভালোলাগে ঘুরে আবার বাসস্টপেজে এসে ফিরে যাব।

বাস যথারীতি শহর ছেড়ে শহরতলী তারপর কি বলব, গ্রামের মধ্যে ঢুকল। গ্রাম বলতে আমাদের যা অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে সামান্যই মিল - ছোট ছোট সুন্দর কাঠের বাড়ী, সঙ্গে অনেকটা জমি যেখানে ফুল বা অন্য কিছুর বাগান তারপর অনেক খানি বোধহয় চাষের জমি। প্রতিটি বাড়িতেই এক বা একাধিক কুকুর। সুইডিস গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে একটা অন্তু সুন্দর পার্ক দেখতে পেলাম। কি সুন্দর সাজানো একটা বেশ বড় পার্ক। একটা ছোট পাহাড় বলব না - টিলাই বলা যায়, সেটাকে একপাশে রেখে একটা অনবদ্য ল্যান্ডস্কেপিং। ক্যামেরাটা আবিনিবড় আফসোস হল। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম সকলকে নিয়ে অবশ্যই আরেকদিন আসতে হবে।

উদ্দেশ্যযৈহীন ভাবে আস্তে আস্তে পার্কের মধ্যের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি আর মনে মনে ভাবছি প্রকৃতির অন্তু সৌন্দর্য কে মানুষ তার কল্পনা এবং মেহনত দিয়ে কি অপার্থিব রূপ সৃষ্টি করতে পারে। চলতে চলতে অনেকবারই থামতে হল ভাল করে দেখার জন্য।

পার্কে সবই আছে, নেই কোন মানুষ। এমনিতে সুইডেন এর লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। হাটে মাঠে ঘাটে লোক সমাগম আমাদের ১২৫ কোটি জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য। তার ওপর এখন দুপুর বেলা। আমার মত লোক ছাড়া কারই বা সময় আছে এ সময়ে পার্কে ঘুরবে। দু একজন যে নেই তা নয় তবে সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

পার্কে অনেক বেঞ্চ রাখা আছে। বলা বাহল্য সবই খালি। খানিকক্ষন হাঁটার পর হাঁটাই দেখি একটা বেঞ্চে এক দশাশই পুরুষ বসে আছেন। বয়স্ক, কিন্তু বেশ মজবুত চেহারা। চোখে চশমা, লাল দাঢ়ি, চোখ যথারীতি কটা। পোশাক ক্যাজুয়াল। চোখাচোখি হতেই হাই বলে সন্তুষ্ণ। আরেকটু এগিয়ে যেতেই জিজাসা করলো - "ইভিয়া"? ঘাড় নাড়তে বসতে বলল। আমিও অনেকক্ষন হেঁটে বেশ ক্লান্ত। বসলাম।

বলল দেখো ইভিয়া নিয়ে আমার একটা খুব দুঃখের ইতিহাস আছে। তুমি ইভিয়ান তাই বলে, একটু হালকা হাতে চাই। আমার তো অফুরন্ত সময় - কিন্তু পার্কের সৌন্দর্যে তখন আমার মনে একটা বিচি নান্দনিক অনুভূতি অনুরণিত হচ্ছিল। তার মধ্যে দুঃখের ইতিবৃত্ত শোনার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তার শোনাবার ইচ্ছের জবাবে না বলতে কেমন বাধ বাধ ঠেকল। বললাম বেশতো - বল।

আমার নাম মিক্কো। আমি কিন্তু ফিনিস। ফিনল্যান্ড এ আমার বাড়ী, আমার বউ এর বাড়ী এখানে, সুইডেনে। সে বাবার একমাত্র সন্তান, বাবার বাড়ীটা সেই পেয়েছে - আমিও সারাজীবন জাহাজে কাজ করে কাটিয়েছি, আমি সেইলার। বছরে দু মাস ছুটি পেতাম। তার মধ্যে বাড়ী করার কথা চিন্তাও করিনি। মার্থার বাড়ীটা খুব সুন্দর। সে নার্স। বছরের ছুটিটা তার সঙ্গে তার বাড়ীতে আনন্দে কাটত। এখন আমি রিটায়ার্ড। মার্থা এখনো কাজ করে। আমাদের কোনো ছেলে মেয়ে নেই। সারা জীবন সমুদ্রে ঘুরেছি। এখন গাছপালা পশুপাখি এসব দেখে সময় কাটাই। এই পার্কটা আমার খুব পছন্দের। মার্থার বাড়ীটা এখান থেকে খুব কাছে। সমস্ত দুপুর আমি এই পার্কের একটা বেঞ্চে বসে কাটাই। খুব ভালো লাগে। পকেট থেকে একটা বিয়ার এর ক্যান বার করে বললো - একটু খাও। আমি খাই না



বলায় একটু আশ্চর্য হল, কিছু বললো না, একটু খেয়ে আবার শুরু করল।

আমার জাহাজ কোম্পানীর সাতখানা কারগো শিপ। কোম্পানী ফিল্যান্ড এর। শুনলে আশ্চর্য হবে আমি যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকলাম, এই কোম্পানী আমাকে সেইলার এর চাকরী দিল বত্রিশ বছর একই কোম্পানীর একই জাহাজে কাটিয়ে রিটায়ারমেন্ট নিলাম, তখন চাকরী বাকি ছিল, আর ভালো লাগল না। জাহাজে ঢুকে যখন অ্যাপ্রেন্টিশ ছিলাম তখন থাকবার জন্য আমাকে জাহাজের মধ্যে একটা ছেট ঘর দিয়ে ছিল। বত্রিশ বছর একই জাহাজে একই ঘরে জীবন কাটালাম। ঘরটার ওপর জানি না কেন অস্তুত একটা মোহ ছিল। প্রোমোশন পেলাম, অনেক বড় অনেক ভালো ঘর আমাকে দেয়া হল, আমি অনুরোধ করলাম আমাকে আমার পুরানো ঘরে থাকতে দেয়া হোক। কোম্পানীর সাত খানা জাহাজ সারা পৃথিবী মাল নিয়ে ঘোরাফেরা করত। নিয়ম ছিল বছরে দু মাস যে দিন ছুটি আরম্ভ হবে, জাহাজ সামনে যে পোর্ট এ থামবে সেখান থেকে আমাকে প্লেন এ বাড়ী পাঠানো হবে। আবার ছুটি শেষ হলে আমার বাড়ীর কাছে যে পোর্টে আমাদের সাত খানা জাহাজের যে কোনো জাহাজ থাকবে বা আসবে সেখানে আমাকে প্লেন এ পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।

আমার জাহাজ ভিট্টোরিয়া কে আমি সত্যিই খুব ভালো বাসতাম, তেমনি ভালোবাসতাম আমার ছেট ঘরটাকে। আগেই বলেছি ছুটির পরে আমাকে আমার বাড়ির সবচেয়ে কাছের পোর্টে সাতখানা জাহাজের যে জাহাজটা থাকবে তাতেই আমাকে রিপোর্ট করতে হবে। আমি কোম্পানীকে একটা বিশেষ অনুরোধ করে ছিলাম, ছুটি শেষে যেন আমাকে আমার জাহাজ ভিট্টোরিয়া তে রিপোর্ট করতে দেয়া হয়। আমার সার্ভিস রেকর্ড অত্যন্ত ভালো ছিল আর ম্যানেজমেন্ট সহানুভূতি প্রবন্ধ ছিল। বেশি প্লেন ভাড়া দিয়েও তারা আমাকে ভিট্টোরিয়া যেখানে থাকতো সেখানে পাঠাত। জাহাজে আমার ঘরে পৌঁছে আমার মনে হত দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে আমি বাড়ী পৌঁছলাম।

অবশ্যই আমাকে আমার জাহাজে রিপোর্ট করতে দেওয়ার আরো একটা কারণ ছিল। আমি ইঞ্জিন রুমে ডিউটি করতাম। যদিও ইঞ্জিন গুলো ঠাণ্ডা রাখার অনেক ব্যবস্থা ছিল কিন্তু ইঞ্জিন রুম বেশ গরম। ওখানে কেউ ডিউটি করতে চাইত না। আমার বাড়ী ফিল্যান্ড এ, ঠাণ্ডার দেশ, গরম আমার বেশ পছন্দ। অনেকদিন ইঞ্জিন রুমে কাজ করে ভিট্টোরিয়ার ইঞ্জিন গুলোর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো যেন ওরা আমার সাথে কথা বলত। জাহাজ যখন জলে থাকত, এক দেশ থেকে অন্য দেশের পোর্টে যেত ইঞ্জিন গুলো পালা করে দিন রাত ডিউটি দিত, আর আমার সঙ্গে গল্প করত। কখনো কখনো তাদের অসুখ করত। ইঞ্জিন এর আওয়াজ শুনে আমি বুবাতে পারতাম কি অসুখ আর কোথায় অসুখ। আমার ওপরে যে ইঞ্জিনিয়ার তিনি প্রথম প্রথম আশ্চর্য হতেন, পরে সোজা আমাকেই জিজ্ঞাসা করতেন। আমার কথা প্রায় সবসময়ে সত্যি হত। নিদানের ব্যবস্থা হতো। ইঞ্জিন আবার হেসে আমার সাথে কথা বলত। সবাই স্বত্ত্বাল নিঃশ্বাস ফেলত। ইঞ্জিন এর সঙ্গে আমার এই ভাব ভালোবাসার কথা ম্যানেজমেন্ট এর কানে পর্যন্ত উঠেছিল। তাই আমার জাহাজে বেশি প্লেন ভাড়া দিয়েও তারা আমাকে ভিট্টোরিয়া তে পাঠিয়ে ইঞ্জিন রুম সহজে নিশ্চিন্ত হতেন। আমিও আমার বন্ধুদের পেয়ে পরম আনন্দে কাজ শুরু করতাম।

এমনি করেই একটা একটা করে একত্রিশটা বছর কেটে গেল। আমার বয়স বাড়ল, দাঢ়ি আর চুলে পাক ধরল, ইঞ্জিন গুলো আর আমার বন্ধু রইল না, তারা আমার আপনজন হয়ে গেল। বয়স তাদেরও হয়েছে, অসুখ বিসুখও বেড়েছে। কিন্তু হেসেখেলে দিন চলে যাচ্ছিল। আমার ঘর সেই প্রথম দিনের ছেট কেবিন টাই আছে। মনের মত করে সাজিয়েছি, সারাদিন কাজ করার পর ঘরে এলে আনন্দে মন ভোরে যেত। ছেট খাট টাতে খুব সুন্দর করে গদি তোষক দিয়ে এমন পরিপাটি করে রাখতাম, শুয়ে পড়লে সারাদিনের ইঞ্জিন ঘরের প্রচন্ড পরিশ্রম নিমিষে চলে যেত। আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। স্বপ্ন দেখতাম ইঞ্জিন ঘরে ইঞ্জিন গুলোর - আমার আপন জনের। চিরদিনই কি কারোর সুখে সচন্দে নির্বিবাদে কাটে? মহারানী ভিট্টোরিয়ারও কাটল না।

সেটা জুন মাস। ভিট্টোরিয়া জাপানের ওসাকা পোর্ট থেকে - না ওসাকার সিস্টার পোর্ট বুসানে কিছু কার্গো নামিয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার কলম্বো পোর্টে কিছু কার্গো তুলতে। যেতে হবে মাল্লাকা স্ট্রেইটস এর মধ্যে দিয়ে। তুমি হয়তো জান মাল্লাকা স্ট্রেইটস হচ্ছে ডানদিকে মালয়েশিয়া আর বাঁদিকে সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে প্রায় নয়শ কিলোমিটার লম্বা একটা স্ট্রেইটস। একসময়ে এর অখ্যাতি ছিল পাইরেসীর জন্য, এখন আর পাইরেসী নেই। ডানদিকে সিঙ্গাপুর থাকার জন্য এখানে সব সময়ে প্রাচুর জাহাজের ভৌত। ভিট্টোরিয়া আমাদের নিয়ে অনেকবার এর মধ্যে দিয়ে গেছে। কিন্তু এই জন মাসের এক বুধবার দিন দুপুরে এক ফ্রিগেট এসে তাকে মারল এক প্রচন্ড ধাক্কা। বিরাট আওয়াজ করে ভিট্টোরিয়া একদিকে কাত হয়ে আবার সোজা হয়ে থেমে গেল। ফ্রিগেট তুমি জান ছোটোখাটো যুদ্ধ জাহাজ। এগুলো খুব মজবুত আর ভারী। ভিট্টোরিয়া একটা সমান্য কার্গো শিপ। এ ধাক্কায় ভিট্টোরিয়ার ডুবে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছি দাঁড়িয়ে আছে। তখনও ভিট্টোরিয়া তে প্রায় ৩৭ হাজার টন কার্গো। তবে এখনো বোঝা যাচ্ছে না তার অবস্থা কেমন।

যখন দুর্ঘটনা হয় আমি তখন আমার ছেট কেবিনটা তে আয়নার সামনে সেফটি রেজার দিয়ে দাঢ়ি কামাচ্ছিলাম। আওয়াজ পেলাম, মুহূর্তের মধ্যে আমি শূন্যে প্রায় ৬/৭ ফুট ওপরে, তার পরে নিচে নামছি, কিছুই বুবাতে পারছিনা ব্যাপারটা কি হচ্ছে। সশ্রদ্ধে আমার এই ভারী শরীর নিয়ে নিচে পড়ার কথা। কিন্তু দেখছি আমি আমার সেই স্প্রিং আর গদি মোরা বিছানায় নিঃশব্দে পড়লাম। একটু সময়



লাগলো পরিস্থিতি বুঝতে। তারপর উঠতে গিয়ে দেখি হাতে রক্ত। বুবলাম রেজার টা গালে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। হাত দিয়ে গল্চেপে, দৌড়ে ডেকে বেরিয়ে দেখি মেটও দৌড়চ্ছে। সকলের উদ্বান্ত অবস্থা। সবাই হিসাব করছে কি হয়েছে। এবার দেখি সাইরেন বাজলো। ইন্টারনাল অ্যাড্রেস সিস্টেম এ ক্যাপ্টেন বললেন - অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কেও প্যানিকি হবে না। সবাই সেফটি জ্যাকেট পরে তৈরি থাক। যারা ডিউটি তে আছ তারা ডিউটি তে থাকবে। যাদের ডিউটি নেই তারা যারা ডিউটি করছে তাদের সেফটি জ্যাকেট পৌঁছে দাও।

আধুনিক পরে জানা গেল সাতজন যারা ডেকে ছিল তারা ছিটকে জলে পরে গেছে। তিনজন ঘরের মধ্যে মাথায় আঘাত পেয়ে মারা গেছে। জাহাজে একটা গর্ত হয়েছে তবে অনেক ওপরে। সেটা দিয়ে জাহাজের খোলে জল ঢেকার সন্তানবন্ধন কম। তাহলেও ভিট্টোরিয়া পেছনদিকে খানিকটা গিয়ে সিঙ্গাপুরে আরো কিছু কার্গো নামিয়ে মেরামতের জন্য ডকে ঢুকবে।

আমার এমার্জেন্সি কল এলো ইঞ্জিন রুম এ যাবার জন্য। গিয়ে দেখি দুটো ইঞ্জিন সামান্য একটু ড্যামেজ হয়েছে। বাকি ইঞ্জিন গুলো মেটায়ুটি চালু। তাহলেও সেদিন বিকেল থেকে সমস্ত রাত্রি কাজ করে আমরা প্রায় পঁচিশ জন, সবকজন ইঞ্জিনিয়ার এমন কি চীফ ইঞ্জিনিয়ার সারা রাত জেগে সব কটা ইঞ্জিন ঠিক করলাম। এতো লোকের মাঝে ইঞ্জিনরা কেউ আমার সাথে কথা বলল না। আমি শুতে গেলাম।

ইনসিগ্নেল এর বামেলা শেষ করে জাহাজ ছাড়তে পরের দিন দুপুর গড়ালো। জাহাজ যাবে সিঙ্গাপুর। কার্গো নামিয়ে ডক এর কাজ শেষ করতে তিন দিন লেগে গেল। কিন্তু দেখা গেল ফ্রিগেটের প্রচণ্ড ধারায় জাহাজের ভেতর ভালো মতোই ড্যামেজ হয়েছে। অনেকখানি কাগো স্পেস ব্যবহার যোগ্য করা শক্ত। সব মিলিয়ে ভিট্টোরিয়ার আন্ত শরীর বিপন্ন বলা যায়।

হেলিস্থিক থেকে সিঙ্গাপুর এলেন হেড অফিস এর রঞ্চী মহারথীরা। তারা দুদিন সিঙ্গাপুরে থেকে ফিরে গেলেন। শোনা গেল ক্যাপ্টেন এর চাকরি থাকবে না অথচ আমাদের ক্যাপ্টেন এর কোনো দোষই ছিল না। এই সব যুদ্ধ জাহাজ গুলোর রকম সকম ই আলাদা। সব সময়ে যুদ্ধাং দেহি ভাব। তা নাহলে এরকম দিনে দুপুরে এরকম এক্সিডেন্ট ! কিছু বলার নেই এরা যুদ্ধ জাহাজ। কলম্বোতে শোনা গেল ভিট্টোরিয়ার ফাঁসির হৃকুম হয়েছে। জাহাজের বয়স অনেক হয়ে গেছে, তও হয়তো আরো ২-৫ বছর চলত, কিন্তু এই এক্সিডেন্ট এর পর আর ওকে চালানো যাবে না। কলম্বো থেকে এ যাবে আলাং। মিকো চোখ তুলে বললে আলাং যান আলাং ? নাম টা শোনা শোনা মনে হচ্ছে, বললাম - না।

তোমাদের ইভিয়া তে গুজরাটের একটা পোর্ট। এখানে জাহাজ ভাঙা হয়। সারা পৃথিবী থেকে পুরোনো ভাঙা চোরা জাহাজ এখানে বিক্রি হয় শুধু ভাঙা রজন্য। সমুদ্রের ধারে সারি সারি জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে, কোনোটা আধা ভাঙা অবস্থায়, কোনোটা সবে এসে পৌঁছেছে। কলম্বো থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়ার পর জানিয়ে দেয়া হলো জাহাজ আলাং যাবে, ওখান থেকে সবাই কে ট্রেনে মুস্বাই নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে সকলকেই বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে। ভিট্টোরিয়া বিক্রি হয়ে গেছে।

যেদিন শুনলাম সেদিন আমার সারা রাত্রি যুবাই হল না। ভিট্টোরিয়ার প্রতিটি ইঞ্জিন আমার আঙীয়, আমার স্বজন, আপনজন। এতোগুলির বিয়োগ ব্যথা কেমন করে সহিব। ক্যাপ্টেন আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন ম্যানেজমেন্ট আপনাকে অন্য জাহাজে কাজ করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, আপনার কর্ম কুশলতা এবং আন্তরিকতা কে আমরা সম্মান জানাই। ম্যানেজমেন্ট এর ইচ্ছা আপনি কোম্পানি তে থাকুন।

আমি আগেই ঠিক করে ছিলাম রিটায়ারমেন্ট নেব। বললাম - আপনাদের অফার এর জন্য ধন্যবাদ। আমি ঠিক করেছি আর চাকরি করব না। আলাং এ পৌঁছে দেখি সারি সারি জাহাজ, আমি মনে মনে দেখলাম ওরই মধ্যে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ভিট্টোরিয়া।

ইঞ্জিন রুমে কদিন থেকে ঢুকছিলাম না। শেষের দিন ঢুকলাম। ইঞ্জিনরা কেউ আমার সাথে কথা বলল না। আমি বিদায় জানাতে পারলাম না। সেদিন রাতেই আলাং ছেড়ে চলে গেলাম। এই হলো ইভিয়াকে নিয়ে আমার দুঃখের ইতিহাস।

মিকো আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি চশমার ফাঁকে তার চোখের কোন চিক্ক চিক করছে।





## বিদেশে বিজ্ঞানের বশে

সুপর্ণা সান্যাল

- হ্যালো, হ্যালো..... হ্যালো মা, শুনতে পাচ্ছো?

দশ সেকেন্ড নিস্তম্ভ।

- হাঁ, হ্যালো..., কে মনু? বল, শুনতে পাচ্ছি। আমি তো ফোনের কাঁপা কাঁপা আওয়াজ শুনেই বুঝেছি যে তুই।
- কি যে বল মা, ফোনের আওয়াজ শুনেই বুঝে গেলে?
- হ্যাঁ রে, বিশ্বাস করছিস না তো! ওরকমই হয়। কত দূর থেকে আসে বলতো।
- মা, কি যে বল! ফোনের আবার কাছের দূরের কি?
- তা আবার হয় না? কত দূর থেকে ভেসে আসে এই শব্দ তরঙ্গ! তোদের খবর নিয়ে আসে। এর জন্যেই তো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি। বল তোরা সব কেমন আছিস? শরীর গতিক ভালো তো?
- হ্যাঁ মা, আমরা সব ভালো আছি। এখানে pollution কম তো, তাই দেশের মত রোজ রোজ সর্দি- জ্বর, পেট খারাপ এসব হয় না।
- তা না হলেই ভালো বাবা, আমরা তো এই সব নিয়েই আছি!
- কিন্তু ওই একটাই সমস্যা মা - বড় কাজের চাপ! দম ফেলবারও জো নেই! আর এই সবে নতুন course শুরু হয়েছে, এক গাদা নতুন ছেলে-মেয়ে! সেই জন্যেই তো রোবার থেকে আর ফোন করতে পারিনি। তুমি নিশ্চয়ই চিন্তা করছিলে.....
- না চিন্তা করিনি রে, জানি ব্যস্ত আছিস! আর কাজের চাপ নিয়ে complain করে কি হবে বাবা! যে পেশা বেছে নিয়েছো তার তো এই-ই দম্ভর। সেই ছেটবেলার কবিতা মনে নেই?

‘বেড়িয়ে যখন পড়েছি ভাই, থামলে তো আর চলবে না।’

হিমালয়ের বরফ যেমন, ভাঙবে তরু গলবে না।’

- তা যা বলেছ, যে জাতাকলে একবার ঢুকে পড়েছি, একেবারে ধসে না গেলে তার থেকে আর কোন ছাড়ান নেই!
- এমন বলছিস যেন কাজ করতে তোর ভালো লাগে না! জোর করে করছিস!
- না না তা একেবারেই নয়, বরং উল্টেটাই ঠিক। একবার যে এই research-এর ভাললাগায় মজেছে সেখানেই তার ঠিক বাঁধা চিরতরে। ভাবত একবার, তা না হলে আমি, বিপ্লব, যারা কিনা বন্ধু-বন্ধব, গান, সিনেমা এসব ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারত না, তারা কিনা আস্ত সতেরোটা বছর কাটিয়ে দিল এই বিদেশে! তায় আবার সাহেবদের দেশ নয়, আমেরিকানদের দেশ নয়, এমনকি জার্মানিও নয়, আমরা কিনা নৌকো ভেড়ালাম এই সুইডেনে! নোবেল প্রাইজ, বার্গম্যান আর বোফোর্স ছাড়া যে দেশ নিয়ে almost কিছুই জানতাম না!
- সতেরো বছর কেটে গেল তোদের? আজও মনে হয় যেন এই সে দিনের কথা। বিপ্লব তখন কানাডায়, তুই একদিন হঠাতে এসে বললি যে মা সুইডেন থেকে একটা ভালো postdoc-এর offer পেয়েছি, ভাবছি যে নিয়ে নেব। আমরা তো আকাশ পাতাল ভাবছি, বিপ্লব এক বিদেশে আর তুই কিনা দুধের ছেলেকে নিয়ে যাবি সম্পূর্ণ অজানা অচেনা অন্য এক দেশে! ছেলেকে কে রাখবে আর কখনই বা কাজ করবি, কে জানে। তোর বাবা কিন্তু একটুও দুশ্চিন্তা করে নি, বলেছিল যে ও ঠিক পারবে।
- তাই তো হল শেষ অঙ্কি, তবে তুমি আর রূকুর ঠাকুরা এসে বাড়ির আর ছেলের হাল না ধরলে হত না, কিছুতেই পেরে উঠতাম না। তোমার মনে আছে মা, প্লেন ধরতে এয়ারপোর্টে যখন ঢুকছি, রূকুর তখন কি আছড়ে পিছড়ে কান্না! কিছুতেই বাবাকে ছেড়ে, রূমি-জিতুকে ছেড়ে যাবে না! আমি ধরে রাখতে পারি না! প্লেনে উঠেও একইরকম, ও নিশ্চয় ভাবছিল যে আমি ওকে ওর সব ভালবাসার মানুষজনের থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি! অনেক অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে শেষে ক্লান্ত হয়ে স্থুমিয়ে পরেছিলি! আমি যেন তখন কি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। চারপাশে কতকিছু ঘটে যাচ্ছিল, কোনকিছুই যেন আমাকে স্পর্শ করছিল না। মনেই পরে না গোটা রাস্তায় কিছু খেয়েছিলাম কিনা, বা কি করে রূকু কে নিয়ে প্রথমবার বিদেশের এয়ারপোর্টে প্লেন পাল্টে গন্তব্যে পৌঁছেছিলাম!
- সে সব এখন অতীত!
- অতীত নিয়েই তো জীবন মা, বেঁচে থাকার অনেকটাই তো অতীতের স্মৃতিচারণ! তোমার মনে আছে মা, Lund-এ এসেই Anders-এর group-এর সঙ্গে সেই বরফ জমা লেকের ওপর bird watching-এ যাওয়া? একে -5C temperature, সঙ্গে তেমনি হাড় হিম করা বরফ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া! আর তোমার গায়ে অঞ্জলি মাসির দেওয়া কাশ্মীরী কোট আর পায়ে কলকাতার বাটার কাপড়ের pumpshoe! আমার বন্ধু মারিয়া সেলমার এখনও বলে সেই



কথা! কি করে যে সেই পাঁচ- ছ' ঘন্টা কাটিয়েছিলে! ভাবলে এখনও মরমে মরে যাই, তখনও প্রথম মাসের মাইনে হাতে আসে নি, একটা ভালো জুতো অবধি কিনে দিতে পারিনি! একবারও বল নি যে কত কষ্ট পেয়েছিলে সেদিন।

- কষ্টের কথা তো মনে পড়ে না, কিন্তু যেটা মনে পড়ে তা হল শুধুই আনন্দ, আমি শাড়ী পড়ে বরফের ওপর ভালো করে হাঁটতে পারছিলাম না দেখে সবাই ই আস্তে আস্তে হাঁটছিল। সেদিন কিন্তু পেঁচা ছাড়া আর কোন পাখিই দেখা যায়নি, তাতেই সকলের কি আনন্দ! আমি ভাবছি যে পেঁচা দেখার জন্যে এত কৃচ্ছসাধন! দেশে কেউ ভাবতেই পারবে না!
- আর Lund এ যে বাড়িটায় আমরা থাকতাম তাতে একটাই শোয়ার ঘর, একটাই বিছানা। তুমি বা রংকুর ঠাকুমা শুতে বসার ঘরে একটা ফোল্ডিং ক্যাম্প খাটে, কোনদিন কিছু বল নি।
- আরে তাতে কি হল, তখন বয়সটাও কম ছিল, এত ব্যাথা-শুলো ছিল না, দিবির ঘূম হত রাতে। তবে মজাও কিছু কম হত না তা বলে। তোর মনে আছে, একবার সেই প্রথম বাড়িটায় কিসের যেন একটা inspection-এ এল। তুই তো lab-এ বেড়িয়ে গেলি, আমি রংকুকে নিয়ে এক। তারপর সেই মহিলা এল, আমি ভাবছি যার এত ফরসা মুখ তার পা গুলো এত কুচকুচে কালো কেন? শেষে আর কৌতুহল ধরে রাখতে পারি না। তুই আসতেই তোকে বল্লুম সে কথা। তুই তো সব শুনে হেসেই বাঁচিস না। বললি যে ও তো একরকম মোজা পড়ে এসেছিল। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি না, একেবারে চামড়ার মতই দেখতে, আবার একেবারে পায়ের ওপর অবধি, এ আবার কেমনতর মোজা!
- সে আবার মনে নেই? এখনও মনে পড়লে নিজের মনেই একচোট হেসে নি। আর মনে আছে প্রতি রোববার তুমি জানলায় দাঢ়িয়ে থাকতে, যদি আর দুটো লোক বেশি দেখা যায়!
- হ্যাঁ, আমি তো রোজ ভাবতাম, এখানে কি একেবারে মানুষজন থাকে না? তারপর আস্তে আস্তে কিছু লোকজনের সঙ্গে আলাপ হল, সুমিতা-তপেশরা এল, ওদের মেয়ে তিনি, রংকুর চেয়ে বছরখানেকের বড়। রংমি সেই একটা প্লাস্টিকে লাগানো একটা স্পঞ্জের রবার দিয়েছিল রংকুকে, স্টোকে নিয়ে দুজনের একদিন কি টানামানি আর ঝগড়া! এখন ওদের তো আর মনে নেই, কিন্তু বললে নিশ্চয়ই দুজনেই লজ্জা পেয়ে যাবে।
- সে তো বটেই। তারপর এক শনিবারে Lund-এর খোলা বাজারে গিয়ে আমরা দুজনে বলাবলি করছি যে এখানে পুঁই শাক পাওয়া যায় কিনা! হঠাৎ পিছন থেকে পরিষ্কার বাংলায় একজন বলে উঠলেন যে - না, পুঁই শাক পাওয়া যায় না, তবে পালং পাওয়া যায় অনেক রকমের। এই ভাবেই বুরুদির সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ থেকে বদ্ধুত, বুরুদির হাফ-বাঙালি সুইডিশ বর লারসের সঙ্গে, মায় ওদের সঙ্গে ওদের summer cottage-এ থেকে এসেছি।
- সে সব কি কম আনন্দের? হ্যাঁরে, ওদের সবার সঙ্গে তোদের যোগাযোগ আছে?
- যোগাযোগ তো মা তুলিতে আঁকা রংছবির মতো, যত রং বোলাবে তত রঙিন। আর রং না বোলালেই রংহীন।
- তাঁঠিক, তবে জীবন তো চলতেই থাকে তার তালে।
- ঠিক তাই মা, তারপর Lund -এর পাঠ চুকিয়ে আমরা চলে এলাম উপসালাতে, তারপর তো স্নোতের মতো কত নতুন মুখ বন্ধু হয়ে গেল, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা, গান-গল্প, হাসিঠাটা, তাদের সবার ভালোমন্দ... কেউ কেউ আবার উপসালা ছেড়ে চলেও গেছে, কিন্তু মনের টান রয়ে গেছে যে কে সেই। এই ভাবেই কবে যে আমাদের বাড়িটা উপসালার সান্যাল বাড়ী হয়ে উঠল সে আর এক লম্বা গল্প!
- সবই ওপরওলার ইচ্ছা বাবা, তিনি করালে তবেই করা!
- সে তোমরা বল মা, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তও তো তাইই বলেছিলেম - প্রবাসে দৈবের বশে..... আর আমি বলি, না, আমাদের সবটাই পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা! আসলে পুরোটাই - বিদেশে বিজ্ঞানের বশে! বিজ্ঞান যদি না আমাদের এই বিজ্ঞ বিদেশে এনে ফেলত তাহলে কি আর এমন করে “বসুধের কুটুম্বকম” হয়ে উঠত? এ সবই বিজ্ঞানবাবার খেলা। তাঁর ইচ্ছেয় যে কত নানারঙের সুতো নিত্য এক গোছায় বাঁধা হয়ে যায়, দেশের বাইরেও দেশ সৃষ্টি হয়ে যায়, তার খেয়াল কে রাখে?

#### পুনর্চঃ

- 1) এই কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে স্মৃতিচারণ একান্তই ব্যক্তিগত, এবং জোর করে না থামালে থামার পাত্র নয়। তাই এবারের মতো এখানেই যতিটানলাম।
- 2) মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে ছন্দ মেলাতে যুতসই শব্দ না পেয়ে 'বশে' শব্দটি অধিগ্রহণ করলাম। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়। আপনারা চাইলে বশের পরিবর্তে রসেবসে কিম্বা গুনেদোষেও পড়তে পারেন।





ছোট গল্প

## কিষাণগঞ্জ ছাড়ুল...

### উজ্জ্বল

মাথাটা এখনও ধরে আছে। তবে, কাল রাতের মতো ও রকম ছিঁড়ে যাওয়া ব্যাপারটা নেই। গোটা জার্নিতে এক ফোটা ঘূম হয়নি। ঠাসা জেনারেল কম্পার্টমেন্টে ঘূম হবে সেটা আশা করেনি মেঘ। আসলে ট্রেনের দলনিতে অনেকের যেমন ঘূমের একটা আবেশ তৈরি হয়, মেঘের ঠিক তার উল্লেটো। ও সেই দুলুনিটা সারা গায়ে মেঘে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে। সরে সরে যাওয়া দৃশ্যপটের মধ্যে বেঁচে থাকার রং খুঁজে পায়। তা সে এসি হোক বা নন এসি.. দু'চোখের পাতা তেমন ভাবে এক হয় না। দু'তিন দিনের জার্নির ক্ষেত্রে বিষয়টা অন্য। তখন তো শরীরের খাতিরেই ঘূম এসে যায়।

কাল সারা রাত সে ভাবেই তাকিয়ে ছিল বাইরে। কত পুজো প্যান্ডেল, আলোর রোশনাই, টুনি-টিউবের গা জড়াজড়ি, মাইকের শানানো আওয়াজ, ঠাকুর নিয়ে যাওয়া - সব দেখেছে। দেখেছে, নিকষ অঙ্ককার বিছানো চরাচরও। আর সেই সঙ্গে পাছ্টা দিয়ে বেড়েছে মাথাধরাটা।

ফ্ল্যাট থেকে যখন বেরিয়েছিল, কমপ্লেক্সের মণ্ডপে তখন সবে দুঘাকে নামানো হয়েছে। পঞ্চমীর সঙ্গে। চার দিকে আলোর ফোয়ারা। ওদের কমপ্লেক্সটাকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। ষষ্ঠী থেকে ওই চতুরে কত কত আনন্দ হবে। ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে, সেখানে নাটক, গান, নাচ আরও কত কী! একটা ছোট পিঠব্যাগ নিয়ে কমপ্লেক্স থেকে বেরনোর সময় মেঘের এক ফোটা ও মনখারাপ হয়নি সে সবের জন্য। একটা অনাবিল আনন্দের খোঁজ অদৃশ্য সুতোর মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছিল যেন বাহির পানে!

পাগলের ওই একটা কথাই মাথার মধ্যে ঝানঝান করে বাজছিল। স্পষ্ট একটা বাক্য। কিন্তু, সেটা এই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে আর মনে করতে চাইছে না মেঘ। সত্যি বলতে কি, বাক্যটা আর মনেও নেই। কী হবে মনে রেখে! তবে, এটা মনে আছে শব্দগুলো মেঘ একেবারেই ডিজার্ভ করে না। সম্পর্ক এত দিন গড়ানোর পর, কথাটা কেউ বলতে পারে! মেঘের ধারণা ছিল না। এর আগে নিজেদের মধ্যে অনেক রকমের ঝামেলা হয়েছে। অশান্তি হয়েছে। বগড়া হয়েছে। কিন্তু, মেঘ তো কখনও এমন করে পাগলকে বলেনি। বলতে পারেনি। ভালবাসা থাকলেই কি সবটা বলা যায়! কলেজ জীবন থেকে একটা কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে এসেছে ও, ‘এভরিথিং ইজ নট ফেয়ার ইন লভ অ্যান্ড ওয়ার’।

আর তখনই ঠিক করে ফেলেছিল, এই উৎসবের আবহে আর এক মুহূর্ত থাকবে না। কিন্তু, যাবে কোথায়? মায়ের কাছে! সন্তু নয়। একটু পরেই পাগলের মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তার পর... না! এই সুযোগটা এ বার আর ওকে দিতে চায়নি মেঘ। আসলে ও সবটা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারে। কী বলেছে, কেন বলেছে, কিছুই মনে রাখতে পারে না। এমনকী, সরিও বলতে পারে না। কিন্তু, মেঘ ঠিক এর উল্লেটো। ওর যে সবটা গেঁথে থাকে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঠিক করে ফেলেছিল, কালিম্পং যাবে। অন্তত কয়েকটা দিন তো পাহাড়ের কাছে থাকা যাবে। আহ! পাহাড় শব্দটাই যেন প্রাণে একটা সুখ এনে দেয়। এই পাহাড়ই তাকে অতীতে অনেক ভাল থাকা দিয়েছে। আসলে মেঘকে বাঁচিয়েই রেখেছে যেন পাহাড়!

পর মুহূর্তেই মনে হয়েছিল, রিজার্ভেশন ছাড়া এনজেপি! তা-ও এই ভরা পুজোর সময়! কাল ষষ্ঠী। কাজেই পঞ্চমীর রাতে উত্তরবঙ্গে ফেরার ট্রেনে ভিড় কেমন হবে, সেটা বেশ বুঝতে পারছিল মেঘ। আর যেতে হলে তো একমাত্র জেনারেল ভরসা! রিজার্ভেশন যারা পায়নি, তারাও জেনারেলে উঠবে। ওখানে যেতে ওর কোনও আপত্তি নেই। এর আগে বার দুয়েক তো জেনারেলেই গিয়েছে। এক বার তো দাজিলিং যাওয়ার সময় মাকেও নিয়ে গিয়েছিল ওখানে। তেমন একটা অসুবিধা হয়নি। সকাল সকালই পৌঁছে যায় ট্রেনটা। উত্তরবঙ্গ যাওয়ার সেরা এই ট্রেনের সঙ্গে মেঘের যেন আত্মিক সম্পর্ক। কিন্তু, কাল সঙ্গের চিন্তাটা ছিল অন্যত্র। আদৌ উঠতে পারবে তো!

সাড়ে সাতটার মধ্যে শিয়ালদহ পৌঁছে একটা জেনারেল টিকিট কেটে উপরের জন আহারেই রাতের যাওয়াটা সেরেছিল। নাহ! দু'গালের বেশি আর গলা দিয়ে নামেনি। মাথাটা তত ক্ষণে ভার হওয়া শুরু হয়েছে। ঘণ্টাখানেক পরে যখন কুলিকে কুড়ি টাকা দিয়ে একটা সিটের ব্যবস্থা করে ট্রেনে বসেছিল, তত ক্ষণে মাথাটা চেপে ধরে রাখতে হয়েছে, এত যন্ত্রণা। কাছে ডিসপ্রিনও ছিল না, যে...

\*\*\*\*\*

শেয়ার সুমোটা থানার মোড়ে নামিয়ে দিল। এর আগে এই কালিম্পং শহরে অন্তত দশ বার এসেছে মেঘ। না, পাগলের সঙ্গে এক বারও



আসেনি। ওর শ্রিয় পাহাড়ে, জীবনের সবচেয়ে আদুরে মানুষটাকে নিয়ে আসা হয়নি। কেন হয়নি, সেটা সুমোতে আসার সময় বেশ কয়েক বার ভাবার চেষ্টা করেছে। মনে করতে পারেনি। গত তিন বছরে ও নিজে পাঁচ বার পাহাড়ে এসেছে। থেকেছে বেশ কয়েক দিন করে। কিন্তু, পাগলের সঙ্গে? না, এক বারও না। ইন ফ্যাষ্ট, পাগলের সঙ্গে ওই পোড়া শহরের বাইরে কোথাও যাওয়া হয়নি।

সেবক পেরিয়ে পাহাড় পেঁচানোর আগেই মেঘের মাথাটা যেন হাঙ্কা হতে শুরু করে। সেবক কালীবাড়িতে এই বষ্ঠীর সকালে বেশ ভিড়। পুজো দিতে এসেছে অনেকেই। মেঘের এ সবে ভক্তি নেই। বিশ্বাসও নেই। তিস্তা বাজার পেরনোর আগেই মাথা থেকে সমতলটা হারিয়ে গিয়েছিল। এনজেপি নেমে মনের ভেতর কী যে চলছিল, কেনই বা স্টেশন থেকে কালিম্পং-এর শেয়ার গাড়িতে উঠে পড়েছিল, কেন যে মোবাইলটা বন্ধ করে দিয়েছিল— সে সব এখন আর কিছু মনে নেই মেঘের। পাগলের সেই বাক্যটার মতো এগুলোও আর মনে করতে চাইছে না। আর না চাইলে, মনে ওর পড়বেও না। এমনই ধাঁচের যে মেঘ!

বহু বার দেখা এই থানার মোড়ে নেমেও মেঘ চারদিকটা নবাগতের মতো চেখে দেখছিল। সব ঠিক একই রকম আছে। সামনের সেই ফুলের দোকান, থানার সামনে সেন্ট্রি, বাঁ দিকে সেই উৎরাই পথ, তান দিকের চড়াই বেয়ে সেই মনেন্দ্রি যাওয়ার রাস্তা... মোড়ের ঠিক মাথাতেই প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে বড় করে। মাইক বাজছে সেখানে। মণ্ডপে ঠাকুরও এসে গিয়েছে। একটা ছেট জটলা। মেঘ একটু এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরের মুখটা ভাল করে দেখল। আপনা থেকেই হাত দুটো জোড় হয়ে এল যেন। কিছু বলল কি মেঘ? নাহ! ও নিজেই শুনতে পেল না।

পুজোর সময় এর আগেও মেঘ পাহাড়ে এসেছে। সে তো তখন সবে কলেজ শেষ হয়েছে। সৌরভ, পার্থ, সোমা আর বহি। সঙ্গে বোনও এসেছিল সে বার। বাপি খুব রাগ করেছিল। কিন্তু, মেঘের জেদের কাছে সবাই পরাস্ত। বাপি চলে যাওয়ার পর থেকে আর কেউ রাগ করার নেই। একটু ভুল হল। পাগল রাগ করে বিভিন্ন বিষয়ে। কিন্তু, সেই রাগ শেষমেশ ওকে কেমন অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। রাগটা আর ঠিক রাগের পর্যায়ে থাকে না। কেমন যেন একটা অন্য মানুষ হয়ে যায় ও তখন!

এক বালকই মনে পড়ল ওর কথা। একটা বাকবাকে সকাল শেষ হয়ে সবে দুপুরের দিকে রোদ গড়ানোর এই মুহূর্তটাতে মেঘের হঠাত ভীষণ খিদে পেয়ে গেল। সকাল থেকে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই খায়নি। সেটা ও সুমোয় ওঠার আগে।

প্রায় এক ছুটে ছুকে পড়ল শরতের হোটেলে। সইসাবুদ্ধ করে তিন তলার ঠিক পিছনের দিকের ঘরের পর্দাটা সরাতেই পাহাড়টা জানলার ক্ষেত্রে ধরা দিল। এখান থেকে এর আগের বার কাঞ্জেজজার মাথাটা দেখে সকালে কী আনন্দটাই না পেয়েছিল মেঘ। পাহাড়টা দেখে বুকের ভেতরটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল। মনটা কেমন নরম হয়ে এল। ব্যাগটা রেখে মেঘ স্নানে গেল। একটু গরম জল আগেই চেয়ে রেখেছিল। সেটা দিয়ে যেতেই...

\*\*\*\*\*

দুপুরে খেয়েদেয়েই বেরিয়ে পড়েছিল মেঘ। হাঁটতে হাঁটতে থানার মোড় পেরিয়ে যে রাস্তাটা হাসপাতালের দিকে গিয়েছে, সেই চৌরাস্তার কাছে একটু দাঁড়াল। কোন দিকে যাবে? বাঁ দিকে নীচে নেমে অনিতাদের বাড়ি? না কি হাসপাতালে গিয়ে এক বার ডাক্তারদাদার সঙ্গে দেখা করে আসবে? আচ্ছা ডাক্তারদাদা আছে তো এখনও? শেষ কবে কথা হয়েছিল? মাস পাঁচেক আগে বোধহয়। পাগলের কোনও একটা সমস্যা নিয়েই কথা হয়েছিল। দাদা ফোনে ওষুধও বলে দিয়েছিল।

দাদার সঙ্গে পরিচয় এই পাহাড়েই। সে বার রুমকির পা অনেকটা কেটে গিয়েছিল কী ভাবে যেন। হাসপাতালের বাঙালি ডাক্তার সেলাই করে দিয়েছিলেন। সাতটা সেলাই। পরের দিকে রোজ হোটেলে এসে দেখে যেতেন। পাহাড়কে ভালবেসে এখানেই থেকে গিয়েছেন ওই ডাক্তার। হাসপাতাল আর প্রাইভেট প্রাকটিস। কিন্তু, সমতলে ফিরে যাওয়ার কথা আর ভাবেননি। হাসপাতালে ডাক্তার আসে, ডাক্তার যায়। তবে, তিনি থেকেই গিয়েছেন। আসলে সেই ডাক্তারবাবুই বেশ কয়েক দিনের মধ্যে শুধু পাহাড়প্রেমের কারণে মেঘের দাদা হয়ে উঠেছিল। সেটা আজও রয়ে গিয়েছে।

এ বারও নিশ্চয়ই দেখা হবে। যদি না এই ডামাডোলের বাজারে ট্রান্সফার না হয়ে যায়। তবে, হয়ে গেলে জানাত। আর দাদাকে ট্রান্সফার করলেও ও যাবে না বোধহয়। প্রাইভেট প্রাকটিস করেই যা রোজগার, তাতে পাহাড় প্রীতিটা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। থেকেই যাবে কালিম্পঙ্গে।

সাত-পাঁচ ভাবার অভ্যেস নেই মেঘের। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমেই গেল। অনিতাদের বাড়ির দিকে। অনিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ডাক্তারদাদা। কালিম্পং শহরেই একটা বইয়ের দোকান আছে ওদের। মূলত পাঠ্যবই। কিন্তু, তার বাইরে এখানকার বাঙালিদের মন সামলাতে অনিতার ভূমিকা অনেকটা। কলকাতা থেকে বই, লিটল ম্যাগাজিন আনিয়ে দেয়। সারা বছরই বাংলা বই পাওয়া যায় ওদের দোকানে। পুজোর সময়ে পূজাবার্ষিকীও। মেঘ বেশ কয়েক বার অনিতাকে বই কিনে পাঠিয়েছে। ও টাকা ট্রান্সফার



করে দিত মেঘের অ্যাকাউন্টে। আর মেঘ কুরিয়ারে বই পাঠাত। সারা বছরই তাই অনীতার সঙ্গে একটা যোগাযোগ থেকে গিয়েছে। অনীতাদের বাড়িতেও দুর্গাপুজো হয়। তার গল্প অনেক শুনিয়েছে সে। মেঘকে আসতেও বলেছে প্রথম দিকে। বাঁ দিকের ঢালে নেমেই মেঘের মনে পড়ে গেল সে কথা। মিনিট দশকের উত্তরাই পথ শেষে অনীতাদের বাড়ি। এই ভর দুপুরে রোদুরটা বেশ নরম হয়ে পাহাড়ের কোলে শুয়ে রয়েছে যেন! চাদরটা একটু বুকের মাঝে গোটো করে নিল মেঘ।

রাস্তার খাঁজে অনীতাদের বাড়িটা কেউ যেন বসিয়ে দিয়েছে। বছর পাঁচেক আগে প্রথম বার দেখে ঠিক যেমনটা মনে হয়েছিল, আজও একই রকম লাগল। হাজারো ফুলের টব দিয়ে সাজানো। ছোট মন্দিরে মানানসই এক দুর্গাপ্রতিমা। কী সুন্দর যে লাগছে। মেরেকেটে হাত চারেক লম্বা হবে। পাড়ারাই কয়েক জন বোধহয় মন্দির চতুরে। এক জন ঢাকিও রয়েছেন। শিলিঙ্গড়ি বা সমতলের কোনও জায়গা থেকে আনা হয়েছে বোধহয়।

মেঘকে দেখেই অনীতার ভাই এগিয়ে এল। একগাল হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দিদিকে ডাকছি। অনীতা ভীষণ খুশি। ও তো ভাবতেই পারেনি। ছুটে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। কী সুন্দর যে লাগছে ওকে...

এর পরের কয়েক ঘণ্টা কী ভাবে যে কাটল! পুজোর গোছানোয় অনীতা জোর করে বসিয়ে দিল মেঘকে। ফল কাটা থেকে মন্দিরে আলপনা - সবেতেই হাত লাগাতে হল। ছোটবেলায় খুব ভাল আঁকত মেঘ। প্যাস্টেল ছেড়ে একটা সময় জলরঙে ক্যানভাস ভরিয়েছে। এই তো বছর দেড়েক আগে নতুন অফিসে জয়েন করার পরেই ধর্মতলার মোড়ের ওই দোকানটা থেকে এক সেট জলরং কিনেছে। কিন্তু, বসা আর হয়নি।

আলপনা দিতে দিতে বাড়ির লক্ষ্মীপুজোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বাপি বেঁচে থাকতে শহরতলির ওই এক চিলতে ফ্ল্যাটেও পুজোটা হত। কিন্তু, সে সব পাট আপাতত চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক অনেক বছর পর এই সে দিন মা সবাইকে ডেকে একটা নারায়ণ পুজো দিল। সবাই এসেছিল। কিন্তু, মেঘ পালিয়েছিল অফিসে। ওদের জলপাইগুড়ির বাড়িতেও অনেক আগে দুর্গাপুজো হত। মেঘ তখনও হয়নি। বাপির কাছে সবের গল্প শুনেছে।

মূল আলপনা আর তার সাঙ্গপাসদের কিন্তু দেখতে বেশ হয়েছে। লাল মেঝের উপর সাদা খড়িমাটির নকশা! নিজের কেমন একটা লজ্জা লাগছিল! অনীতারা খুব প্রশংসন করছে। দেখতে দেখতে কখন যেন বিকেল নেমে এসেছে। পাহাড়ি বিকেল যেমন ঝুপ করে চলে আসে, সঙ্গেও। টুনির চেনে গোটা বাড়িটা অপরূপ ভাবে সেজে উঠেছে। পুরোহিত চলে এসেছেন। বোধন হবে। মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা। এই মূর্তির সঙ্গের অসুরটা ভীষণ সুইট। বড়-ভারী মুখ। চোখটা টকটক করছে লাল। কিন্তু, বীরবিক্রমে পাঞ্জা নেওয়ার ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে হাতে অস্ত্র নিয়ে। কিন্তু, মা দুঃখার মুখে সে সব দেখেও একটা প্রশংসনির হাসি।

সবটার সঙ্গে মেঘ কেমন ভেসে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কত দিনের চেনা সবাই। বোধনের সময় খুব কাছ থেকে দেখল সবটা। একটা সময় উঠে সকলের মতো ঢাকে তিন-চারটে কাঠির বাড়িও দিল ও। অনভ্যস্ত সেই ঢাকে-কাঠি অন্য এক উন্মাদনা এনে দিল ওর শরীরে। কেমন যেন সব দুলে দুলে উঠেছে। প্রাণে, মনে, শরীরে এক অচেনা আনন্দ। অজানা মাদকতা। ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। কিন্তু, রাত নেমে আসছে...

\*\*\*\*\*

একটু আগেই শরতের হোটেলে দুকেছে মেঘ। কালিস্পং শহরটা বড় তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। অনীতাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ভেবেছিল দাদার খোঁজটা এক বার নিয়ে আসবে। কিন্তু, ইচ্ছে হয়নি আর। শরীর, মনের দুলুনিটা কিছুতেই থামছে না। ঢাকের শব্দ, পুজোর আয়োজন, আলপনা, মন্ত্রোচ্চারণ - সব একসঙ্গে কেমন মেঘকে আবেশের বাক্সে পুরে রেখেছে। সেখান থেকে আর বেরতেই চাইছে না মেঘ।

ওদের বাড়ি থেকে প্রসাদ খেয়ে প্রায় মাতালের মতো হোটেলে ফিরেছে। মাথার মধ্যে কেউ যেন বেশ কয়েক বোতল মদ পুরে দিয়েছে। টলমল মনে আনন্দেরা ছটফট করে বেড়াচ্ছে। বিছানায় শুয়ে একটা পায়ের উপর আর একটা পা তুলে অনেক দিন পর, অনেক অনেক দিন পর, মেঘ গেয়ে উঠল সেই গানটা। বাপির সঙ্গে যেটা মাঝে মাঝেই ও আর বোন গাইত...

\*\*\*\*\*

মনের ভিতর ভীষণ এক আনন্দ গুণগুণ করতে করতেই ফ্রেশ হয়েছে। চেঞ্জ করেছে। তার পর শুয়েও পড়েছে মেঘ। কিছু খায়নি। ঘুমটাও এসে গিয়েছিল। সকালে উঠে অনীতাদের বাড়ি যেতে হবে। তার আগে ডাঙ্গারদাদার কোয়ার্টার। কাল সগুমী। আর এক প্রস্তুত আনন্দ। মাঝে রাতে হঠাৎ...

একটা কিন্তু মুখ মেঘের মুখের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার মুখ! মেঘ চিনতে পারছে না। একটু বড়, ভারী। লাল চোখ, টকটক করছে।



বিকৃত ভঙ্গিমায় কেবলই ওর মুখের দিকে গর-গর করতে করতে নেমে আসছে। আর মেঘ মুখ সরিয়ে নিচ্ছে। আবারও নেমে আসছে। মেঘ ফের সরিয়ে নিচ্ছে। হাতের তেলো দুটো চেপে রেখেছে ওই শরীরটা। আর মুখটা নিয়ে বার বার ধেয়ে আসছে। মেঘ ঘেমে উঠছে। চিৎকার করতে চাইছে। পারছে না। ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবে কী করে? কে ও? কেন? মেঘ ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় কেঁদে উঠল সজোরে।

সুমটা ভেঙে গেল। প্রচণ্ড ভয় করছে। ভূতের ভয় তো নেই মেঘের। চিরটা কাল একাই শুয়ে এসেছে। বোনকেও কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। ইদনীং পাগল...

দরজা খুলে বাইরে এল মেঘ। হোটেলের লবিতে বেশ কিছুটা সময় হাঁটাহাঁটি করে একটু জল খেয়ে ফের শুয়ে পড়ল। ভয়টা থেকে বেরতে মেঘ আজ দুপুর থেকে রাতের সব ক'টা ছবি রিওয়াইন্ড করে দেখতে থাকল। পাহাড়ি পথে উঠে আসা, কালিম্পং শহরের নানা ছবি, অনীতাদের বাড়ির পুজো, ফল কাটা, আলপনা, ঢাক বাজানো— মোবাইলটা বন্ধ রাখা বলে একটাও ছবি তোলা হয়নি। যদিও মেঘ মোবাইলে ফটোফট খুব একটা ছবি তুলতে ভালবাসে না। পাগলের ওই অভ্যেসটা মারাত্মক। আচ্ছা কথায় কথায় কেন এত বার পাগল চলে আসছে? ভয়টা আস্তে আস্তে কাটছে।

বিছানা থেকে উঠে জানলার পর্দাটা সরালো মেঘ। গোটা পাহাড়ের গায়ে হাঙ্কা লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। ভোর হয়ে এসেছে। বাইরে পুজো প্যান্ডেলের মাইকটা ও চালু হল। ইয়া দেবী সর্বভূতেষু... আর ঠিক তখনই জানলার ফ্রেমে কাঞ্চনজঙ্গার মাথাটা ধরা দিল। ওয়াও! মুখ থেকে শব্দটা ছিটকে বেরিয়ে এল। এই শব্দটা পাগল খুব বলে। এ কি দেখছে মেঘ! কাঞ্চনজঙ্গা! বিশ্বাস হচ্ছে না। আনন্দে মেঘের লাফাতে ইচ্ছে করছে। কালকের আনন্দটা ফের ফিরে এসেছে যেন। আর এখন সব মিলিয়ে... উফ... কেমন একটা পাগল পাগল দশা ওর!

এই দৃশ্যটা ধরে রাখতেই হবে। এমন মুহূর্ত ধরে না রাখলে, গ্রেট মিস হয়ে যাবে।

পিঠ ব্যাগটা টেবিলের উপর থেকে নিয়ে ভেতর হাত গলালো মেঘ। আইফোনটা বের করে উপরের বাটনটা চেপে ধরতেই আধ-খাওয়া সাদা আপেলটা জুলজুল করে উঠল। কয়েক সেকেন্ড পরেই পিং পিং শব্দে বেশ কয়েক বারের বাজনা। ক্যামেরার আইকনে আলতো ছোঁয়া দিয়ে মেঘ ছুটে ফের জানলার ধারে। কাঞ্চনের মাথাটায় কে যেন লাল আবির ঢেলে দিয়েছে। টকটকে... ক্যামেরার গোল খোপটা অনেক অনেক বার ছুঁয়ে দিল মেঘ। আর সবটা বন্দি হতে থাকল ওর দু'আঙুলের ফাঁকে ধরা ফোনটায়।

উফ! লাফাতে লাফাতে খাটে ফিরে এল মেঘ। ফোটোস-এ গিয়ে ছবিগুলো দেখে ফোনটা বন্ধ করতে যাবে... স্ক্রিনে পাগলের মুখটা বার্তাসমেত টুক করে ভেসে উঠল। নোটিফিকেশন - 'কিষাণগঞ্জ ছাড়ল...' সঙ্গে সঙ্গে সেখানে টোকা মেরে গোটা বার্তায় চুকল মেঘ। 'কিষাণগঞ্জ ছাড়ল। কোথায় আছিস জানাস। এনজেপি থেকে কোথায় যেতে পারিস তা আমার বোকার বাইরে। গোটা পাহাড়টাই তো তোর। সেখানে খোঁজা, আমার সাধ্য নেই। এ বারের পুজো তোর পাহাড়েই কাটাব। পিজ, জানাস।'





চিঠি

## যাবি আমার পাহাড়ে? সুচরিতা

কেমন আছিস রে? অনেক বছর পর তোকে চিঠি লিখছি। চিঠি না, আসলে ই-মেল। একটা সময় ছিল কত চিঠি লিখেছি তোকে। সব শেয়ার করতাম। আসলে এখন যোগাযোগের অনেক অপশন। কিন্তু, যোগাযোগটাই কমে গিয়েছে। আমার মনটা ভাল নেই, তাই তোকেই আবার লিখতে বসলাম। তোর থেকে ভাল কে আর বুঝবে বল।

জানিস, পাহাড়টা বড় খারাপ আছে আজকাল! দার্জিলিঙ্গের কথা বলছি। খবরে নিশ্চই দেখেছিস। কতদিন দেখা হয়নি। কত দিন সবুজে, মেঘে সেজে ওঠা পাহাড়ের রূপে মুঞ্চ হয়নি দেশ, বিদেশের বন্ধুরা। দার্জিলিং ম্যালের পিছনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবাক চোখে কেউ থমকে যায়নি কোনও এক অচেনা ফুল দেখে। সেই পিছনের রাস্তায়, ম্যালের রেলিং-এ হেলান দিয়ে কতদিন কোনও প্রেমিক-প্রেমিকা ভবিষ্যতের স্বপ্নে ঢুবে যায়নি। কত সকাল, বিকেল, রাত কেটে গিয়েছে— কিন্তু দার্জিলিঙ্গের ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে একে অপরের উষ্ণতায় অভিমান ভাঙ্গায়নি কোনও হানিমুন কাপল। আর ওই ভূটিয়া মার্কেট? নানান পসরা সাজিয়ে বসে স্থানীয়েরা। কী না কিনেছি সেখান থেকে! তোর জন্যও জ্যাকেট এনেছিলাম শেষবার। মনে আছে তোর? কিন্তু এখন ওদের জীবন কী ভাবে চলছে?

মনটা বড় খারাপ, জানিস। আমার তো সবই ওই পাহাড়। আমার মন ভাল করার দাওয়াই। তোর থেকে ভাল আর কে জানে, বল!

তুই তো চলে গেলি দেশ ছেড়ে। ওখানে এ সব হয় না, তাই না? যখন খুশি যেখানে ইচ্ছে চলে যাওয়া যায়। পছন্দের জায়গায়। আমি পারছি না আমার পছন্দের দার্জিলিঙ্গে যেতে। প্রথমে রাস্তা আটকালো মানুষ। তার পর প্রকৃতি। ট্রেন চলছে না। বন্যায় ভেঙে গিয়েছে সব ট্রেন লাইন। মানতে পারছি না আমার পাহাড়ের মানুষগুলো ভাল নেই বলে। ওরা একদম ভাল নেই। ওরা তো বাঁচে ট্যারিজমের উপর। কেউ যাচ্ছে না যে! কেউ যেতে পারছে না। ওরা কী খাবে? গরমের ছুটিতে হঠাতে করেই সব বন্ধ। বাতিল হয়ে গেল সব বুকিং। কত শত পরিকল্পনা, সব যে ভেঙ্গে গেল! এখন নিজেরা কী খাবে, বাচ্চাদের কী খাওয়াবে সেটা ভেবেই যে মাথায় হাত ওই মানুষগুলোর!

আর একটা কাশীর চাই না, জানিস। বুবোই পাচ্ছি না, কে বাঁচাবে আমার দার্জিলিংকে। যাঁদের হাতে আমাদের দায়িত্ব, তাঁরাই যে লড়াই করে মরছে। ঠাণ্ডা ঘরে বসে শুধু মিটিং করছে। সবটা যে তিমিরে ছিল, সেই অন্ধকারেই পড়ে রয়েছে। ওই মানুষগুলোর কথা কি কেউ ভাববে না? তিস্তাপারের কাশফুলের দলও যে বড় একা। কেউ ওদের দেখছে না। তিস্তাও বয়ে চলেছে একা একা। এ বার বড় ভাসিয়েছে এ-কুল ও-কুল। ও তো রাগে ফুসছিল এত দিন। আটকে রেখেছে কংক্রিটের বেড়াজালে। সুযোগ পেয়েই তাই বয়ে গিয়েছে যেখানে পেরেছে। প্রকৃতিকে আটকালে এমনই হয়।

লামাহাটা, বড়মাঙ্গোয়া, ইচ্ছেগাঁও, তিনচুলে, তাকদা— কত কত নাম মাথার মধ্যে ঘুর ঘুর করছে। চোখের সামনে ছবির মতো সরে সরে যাচ্ছে প্রকৃতি, সেখানকার মানুষগুলো। তাঁদের ভালবাসা, তাঁদের আতিথেয়তা, তাঁদের হাতের রাখা, সব... তোর মনে আছে প্রথম বার বড়মাঙ্গোয়ায় যাওয়ার স্মৃতি? প্রতি দিন ফেসবুক খুলে ওই বারান্দার ছবি দেখতাম আর প্ল্যান করতাম। তার পর এক বার হয়েই গেল। তার পর থেকে যে কত বার গিয়েছি। তোর সব মিস!

মাবো মাবোই কয়েকটা ফোন আসে, হতাশ গলায় জানতে চায়, ‘দার্জিলিঙ্গের মানুষগুলো বড় কষ্টে আছে গো দিদি! একটু জানাবে কী হচ্ছে ওখানে?’ আমি বলি, ‘কোথায়?’ ও বলে, ‘কলকাতায়, দিল্লিতে।’

সে দিন ফোনটা এসেছিল লামাহাটা থেকে। এক দিন নয়, মাবো মাবোই সেই হোম স্টের দিদির ফোন বেজে ওঠে। ধরতে হাত কেঁপে যায়। কী বলব ওদের বল তো! সত্যিই তো কিছু জানা নেই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে সেই দিদি তা-ও একরাশ আশা নিয়ে ফোন করেন। ‘কিছু কি জানা গেল? আমাদের এখানে তো সব চ্যানেল বন্ধ। কিছুই জানতে পারি না।’ ব্যাক বন্ধ, এটিএম বন্ধ, গ্রামের বাইরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ, ছেলে-মেয়েদের স্কুলও বন্ধ। এর পর তো খাবারও বন্ধ হয়ে যাবে। লামাহাটায় তোর যাওয়া হয়নি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীরই আবিষ্কার। তাঁর স্বপ্নের লামাহাটাও কাঁদছে। দেখতে পাচ্ছে না কেউ।



বাতিল হয়ে গিয়েছে সব বুকিং। ওই যে গরমের ছুটিতে একসঙ্গে প্রচুর লোকের বুকিং হয়েছিল বলে, অনেক টাকা খরচ করে ঘর বাড়াচ্ছিলেন এই হোম স্টে মালকিন। বাতিল বুকিং-এর টাকা ফেরত দিতে গিয়ে তাও অর্ধেক হয়ে পড়ে। শুধু কি তিনি! সে দিন বড়মাঙ্গোয়ার হোম স্টে তে ফোন করে বললাম, ‘আসা যাবে এক দিনের জন্য?’ আঁতকে উঠলেন মালিক– ‘বলছেন কি ম্যাডাম, একদম আসবেন না।’ এমনটাও হয়, ভাব! এই তো বছরের কয়েকটা সময় যখন এই পাহাড়ি মানুষগুলো সারা বছরের বাঁচার রসদ জমা করে রাখেন। এই বছরটা কাটবে কী করে? প্রশ্নটা যে কাকে করব বুঝতেই পারছি না। জানিস কী অবস্থা, হোম স্টে-র সেই দিদি ফোন করে আমার কাছে জানতে চাইছেন, পুজোর বুকিং নেবে কি না। তুই থাকলে কী করতি? ভীতু ছিলি, যেতে চাইতি না। আমার যদিও যাওয়া হয়নি।

সব ভুলে আবারও মানুষ পাহাড়মুখী হবে। কিন্তু, এই মানুষগুলোর বুকে দগদগে ক্ষত। জুলে যাওয়া ঘর বাড়ি। দাউ দাউ করে জুলতে থাকা থানা, গাড়ি। মনে পড়ছিল, সেই জুলে যাওয়া তাকদা বনবাংলোকে কাছ থেকে দেখার স্মৃতি। সেটা তো তুইও দেখেছিলি। সবুজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কক্ষালসার একটা হাঁ করে থাকা বাংলো। এ ভাবে এ বারও হারিয়ে গিয়েছে কত কত ভাললাগা। আবার হয়তো সব মুছে নতুন করে তৈরি হবে সব। দার্জিলিং ম্যালের সেই আগুন, কার্শিয়াঙ্গের বুক কঁপিয়ে বিস্ফোরণের সেই শব্দের স্মৃতি কি কখনও গভীর রাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেবেনা এই পাহাড়ি মানুষগুলোর? ওরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে তো?

বল না, তোর কি মনে হয়? এক বার যাবি? নিজের জন্য নয়, ওই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াতে। ওদের মুখে যদি হাসি ফোটে।  
কিন্তু, আমরা পৌঁছতে পারব তো?



Drawing : Abantika Sengupta



## বকুলদার প্ল্যানচেট

### কুমার উৎপল

আন্তঃজেলাগামী বাসটা এবার মাইজিদি এলাকায় এসে পড়লো। আমি মাকে নড়ে চড়ে বসতে দেখে বললাম, মা, আমরা কি মামা বাড়ি এসে গেছি?

হাঁ। তা বলতে পারিস এক রকম। এবার সোজা হয়ে বস। সামনের বাঁক পেরোলেই সোনালী ব্যাংকের সাইনবোর্ড দেখা যাবে। আমরা ওখানেই নামবো। নে জিনিষপত্র সব গোজগাজ করে নে বলে মা আমাকে তাড়া দিলো আর নিজেও বাক্স প্যাট্রাঙ্গলোর তদ্বির শুরু করে দিলো। বাবা এবার আসতে পারেনি। অফিসের কাজে আটকা পড়েছে। আমাদের বাসে উঠিয়ে দিয়ে অফিসে চলে গিয়েছিলেন।

ড্রাইভারের হেলপারটা যে কিনা বাসের ভেতরটা সামলাছিল তাকে ডেকে মা বললো, সোনালী ব্যাংকের সামনে নামবো। সাথে বাচ্চা আছে। ড্রাইভারসাবকে একটু সুন্দর করে বাসটাকে থামাতে বলে দেন। বাচ্চা বলাতে আমার একটু খারাপ লাগলেও মাকে এ নিয়ে কিছু বললাম না। এই আসার সময়ই মা আমাকে পই পই করে বলেছিল, নিজের জিনিষ এখন নিজেই গুছিয়ে রাখবি। মামা বাড়িতে বাণ্ডারিক শান্ত উপলক্ষে এখন অনেক লোকজন। আমার পক্ষে তোর সব জিনিষ পাহারা দেয়া সন্তুষ্ট হবে না। তুই এখন বড় হয়ে গেছিস। ক্লাস ফাইভে পড়ছিস। দায়িত্বজ্ঞান কিছু নিতে শিখ। সেই মা বলে কিনা আমি এখন বাচ্চা। বাসটাকে থামাতে বলার একটু পরেই হেলপারটা বাসের গায়ে হাত দিয়ে ধড়াম করে একটা বাড়ি মেরে বললো, সোনালী ব্যাংক, লেডিস নামবো।

যখনকার কথা বলছি তখন মোবাইল ফোন আসেনি বাজারে। আর ফেসবুকে আপডেট দেয়ার ব্যাপারটাও তখন অজানা ছিল। পৌছানর খবর মানে বড়মামাকে তাঁর আয়ুর্বেদিক দোকানটা থেকে বাবার অফিসে ফোন করে দিয়ে বলতে হবে মা মঙ্গলমতেই মামা বাড়ি পোঁছেছেন।

গাড়ির গতি স্থিথ হয়ে আসলে মা বললো, সামনের রডটা শক্ত করে ধরে থাক। গাড়ি এখনি ব্রেক কষবে।

বাসটা ফুটপাত ঘেঁষে রাখতে গিয়েই একটা গর্তে পেছনের চাকাটা পড়ে গেলো এবং সেই সাথে বাসের পেছন দিকটা একটু লাফিয়ে উঠলো। ভাগিয়স রডটা শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম নইলে মাথাটা গাড়ির ছাদে ঠুকে যেতে পারতো।

বাস থেকে নেমেই দেখি ফুলদি দাড়িয়ে আছে ফুটপাতেই। ওহ ফুলদির কথা তো তোমাদের বলা হয়নি। ফুলদি আমার মেজমাসির বড় মেয়ে। মাইজিদির ওই সোনালী ব্যাংকটার পেছনে রাম ঠাকুরের যে আশ্রম ঠিক তার পেছনেই ফুলদিদের বাড়ি। বাড়িটার একটা সুন্দর নামও আছে। সংগীতা। মেসোর পছন্দের নাম। ফুলদি খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। রেডিওতে গায়। বাড়ির নামটা তাই আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। মেসো কি ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিলেন? না সবজানা? তা না হলে কি করে জানলেন যে ওই বাড়ি থেকে সকাল সঙ্গে গানের সুর বাতাসে ভেসে বেড়াবে এবং এক দিন সেই সুর বেতার তরঙ্গে করে সারা দেশে ভেসে বেড়াবে।

ও মাসী, কোন কষ্ট হয় নি তো পথে? কাছে এসে ফুলদি মাকে জিঞ্জেস করলো।

না, রাস্তায় কোন ঝামেলা হয় নি। তোর মেসো ও দিক থেকে উঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর এই তো নামলাম। তিন ঘন্টা দেখতে দেখতে কেটে গেছে। চল মালগুলো উঠিয়ে নিতে বল তাড়াতাড়ি। আমাকে একটু বাথরুমে যেতে হবে, মা বললো।

ফুলদি লোক ঠিক করেই রেখেছিল। রাখাল তার নাম। পরণে চেক চেক লুভি আর গায়ে কালো রঙের গেঞ্জি আর মাথায় একটা পাগড়ি বিড়ের মত করে বাঁধা।

এই রাখাল, তাড়াতাড়ি একটু হাত লাগানারে ভাই। ফুলদি রাখালকে তাড়া দিল। রাখাল বাটপট দুহাতে আর মাথাতে তাদের চারটা ব্যাগই কায়দা করে উঠিয়ে নিয়ে হন হন করে সামনে এগুতে থাকলো। দেখে মনে হলো রাখাল আগে থেকেই জানতো তাকে কি করতে হবে কোথায় যেতে হবে।

ফুলদিদের বাড়িতে আমি আগেই থেকেছিলাম। পাকা মেঝে আর টেউ টিনের ছাউনি দেয়া বাড়িটা। সামনে তুলসীবেদী। লোহার গ্রীল ঘেৰা বারান্দা। লোহার পাত দিয়ে সেখানে নাম লেখা হয়েছে সংগীতা। বারান্দার চালের পাশ ঘেঁষেই একটা সুপারি গাছ। সেটা বেয়ে অনায়াসেই চালে উঠা যায়। পাশে একটা বরই গাছ। চালে বসেই সে গাছ থেকে বরই পেড়ে নুন বাল দিয়ে খাওয়া যায়। একটু পরেই পুরুর পাড়। তার আগে কলঘাট। টিউওয়েল থেকে হাতল চেপে চেপে পানি ওঠাতে হয়। কলঘাটের সাথে লাগানো বাথরুম টয়লেট। পুরুর পাড়ে উচ্চ নারকেল গাছ আছে দুটো। সাথে ছেট একটা বাগান। বিভিন্ন জাতের ফুলগাছ লাগানো। জবা আছে কয়েক ধরনের। বাড়ির বাইরের দরজাটা ঠেলে খুলতেই মা স্টান বাথরুমের দিকে দৌড় লাগাল। রাখাল বারান্দায় সব জিনিষ উঠিয়ে দিয়ে নীরবেই চলে যাচ্ছিল। ফুলদি বললো, দূরে কোথাও যাসনে। তোকে পরে আবার লাগবে। রাখাল মাথা নেড়ে সায় দিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে গেলে ফুলদি ভেতর থেকে গেটটা বন্ধ করে দিল।

ফুলদি, ঘরে দেখছি কেউ নেই। তুমি একা আছ? আমি ফুলদিকে একা দেখে বিস্মিত হলাম।

আমিও তো ছিলাম না। কিছু আগেই না এলাম এখানে, ফুলদি বললো। গতকাল থেকেই তো আমরা সবাই মামা বাড়িতে। রাতে এ



বাড়িতে ওখান থেকে কেউ একজন এসে থাকে।

এই ফাঁকে বলে রাখি আমার মেজমাসির বাড়ি মাইজদি শহরেই আর মামা বাড়িটি মাইজদি শহর থেকে আধা ঘন্টা রিক্সা টানা দূরত্বে।  
রাজগঞ্জে।

নে, তুই ও হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নে। আমি দুটো রিক্সা ব্যবস্থা করছি রাজগঞ্জ যাবার জন্যে। দিদি একটু থেমে আবার জিজেস  
করলো, খিদে পেয়েছে নাকি? কিছু খাবি? রাজগঞ্জে যেতে কম পক্ষে আরও কম করে হলেও আধা ঘণ্টা লাগবে।

না, মামা বাড়িতে গিয়েই খাবো। তুমি রিক্সা ডাকতে যাও। আমার আর তর সইছিলো না। মনটা অধীর ভাবে ছুটে যাচ্ছিল মামা বাড়িতে।  
মামাতো ভাই বোনরা আছে, মাসতুতো ভাই বোনরা এসে গেছে। আর আছে পাঢ়ার বন্ধুরা। গত বছরই তো এদের কয়েক জনের সাথে  
এমন ভাব হয়ে গিয়েছিল যে সে যখন চলে যাচ্ছিল ওরা তো কেঁদেই ফেলেছিল। তারও চোখে জল এসে গিয়েছিল। এখন আবার তাদের  
সাথে দেখা হবে ভাবতেই আমার মনটা আনচান করে উঠছিলো।

ততক্ষণে মার বাথরুম সারা হয়ে গেছে। মা এলে ফুলদি রিক্সা ডাকতে বেরিয়ে গেল। আমি কলঘরের দিকে ছুট দিলাম। মুখে হাতে জল  
দিয়ে সতেজ হয়ে উঠতে হবে। মা বারান্দায় রাখা একটা চেয়ারে বসে নতুন করে ব্যাগ গুছাতে লাগলো। এবার শুধু বড় একটা স্যুটকেস  
যাবে বাকী সব জিনিস মেজমাসির বাসাতেই রেখে যাবে মা আগেই ঠিক করে রেখেছিল।

গেটের ওপাশ থেকে ক্রিং.. ক্রিং.. আর টুং টাং আওয়াজ আসতেই বুবাতে পারলাম ফুলদি রিক্সাটোকে একেবারে ঘরের সামনে নিয়ে  
এসেছে।

আমি আর ফুলদি একটা রিক্সায় উঠলাম। মা অন্যটায়। রাখাল মা রিক্সায় উঠে বসলে পরে স্যুটকেসটা রিক্সার পাদানিতে বসিয়ে দিল।  
মা তার উপরে পা রেখেই বললো, এই তোরা ঠিক ভাবে বসেছিস তো? কথার লক্ষ্য আমরাই। ফুলদি চেঁচিয়ে বললো, হাঁ মাসী। তোমার  
রিক্সাটাকে আগে যেতে বলো, আমরা তোমাদের পেছন পেছন আসছি। মার রিক্সাটা আমাদের রিক্সাটাকে পাশ কাটিয়ে হন হনিয়ে  
এগিয়ে গেল। পর পরই আমাদের রিক্সাটাও রাস্তায় উঠে পড়লো।

মাইজদিবাজারটা যেন শুধু একটা বড় রাস্তা। দুপাশে বিভিন্ন দোকানপাট। ফুটপাতেও কেউ কেউ সওদা নিয়ে বসেছে। যা কিছু দেখার বা  
কেনার আছে সবই এই রাস্তাটার উপরে। ডাব কলা বিক্রি করছে লোকে। কাঁচা বাজারও বসেছে। ঠেলাগাড়ীর উপর সাজানো কিছু  
দোকানও আছে। সেখানে কাঁচের চুড়ি ফিতা সেফটি পিন সুগন্ধ সাবান সবই পাওয়া যায়। ওই তো সেই সাহা বস্তালয়। ওখান থেকেই  
আমরা সবাই গতবছর জামা কাপড় কিনেছিলাম। মামা কিনে দিয়েছিলেন।

বাজারের রাস্তাটা শেষ হতেই দিগন্তটা হঠাতে করেই যেন বিশাল হয়ে গেল। দুপাশে খোলা জায়গা, জলা জমি আর ধান ক্ষেত। মাঝে  
মাঝে ছোট ছোট বাড়ি ঘর। কোন পাড়া হবে। গায়ে খুব ফুরফুরে বাতাস লাগছিলো। মাথার চুলগুলো আর আমার ওড়ন্টাও উড়ছিল  
তাতে। ফুলদি ধর্মক দিল, এই জাপানি, ওড়না গুজে রাখ। নইলে ওটা কোন সময় যে চাকায় পেঁচিয়ে গিয়ে গলায় ফাঁস লাগাবে টেরও  
পাবিনা।

ফুলদি মাঝে মাঝে আমাকে জাপানি বলে ডাকে। বিশেষ করে যখন তার মনটা খুশী খুশী থাকে। এই জাপানি নামটা আমি কোন সময়  
জাপান দেশে থেকে ছিলাম বলে নয়। তার অন্য শানে নজুল আছে। আমার নাকটা একটু বোঁচা। ভাই বোনরা তাই ক্ষেপাবার জন্যে  
আমাকে বুঁচি বলে ডাকে। ফুলদিও তাই করে। তবে একটু পরিশীলিত ভাবে। আমাকে জাপানি বলে ডাকে। মানেটা ওই একই। বাইরের  
লোক শুনলে চট করে বুবাতে পারবে না এই যা তফাত। আমি রাগ করলাম না। রাগ করলেই দেখেছি সবাই মজা পায় বেশী। আর তা  
ছাড়া আমার মন্টাও খুব ভাল ছিল। আমি কথা না বাড়িয়ে ওড়ন্টাকে কোমরে গুঁজে নিলাম শুধু।

সামনের রিক্সাটা একটা সাঁকোর সামনে এসে দাঁড়াতেই বুবাতে পারলাম আমরা গন্তব্যে এসে গেছি। মা রিক্সা থেকে নেমে পড়েছে  
দেখলাম। একটু পরেই আমাদের রিক্সাটাও পেছনে এসে থামলো। আমি লাফ দিয়ে নেমে গেলাম আমার আর তর সইছিল না। সাঁকোটা  
হেঁটে পার হতে হবে। তার নীচ দিয়ে ছোট একটা খাল। খাল বললাম বটে তবে মোটেই প্রশংস্ত নয়। আমার মনে হয় গত অলিম্পিকে যে  
মেয়েটা লাফে প্রথম হয়েছিল সে অন্যায়ে সেটা পার হয়ে যেতে পারবে। খালটা রাস্তার পাশ রেঁমে এঁকে বেঁকে চলে গেছে।

গত বছর এখানে বাঁশের সাঁকো ছিল দেখেছিলাম। অনেক কায়দা করে পার হতে হতো। এবছর দেখলাম সেটা কাঠের হয়ে গেছে।  
একটা রিক্সা কোন রকমে এপার ওপার করতে পারে। মা নেমে পড়লে রিক্সাওয়ালা রিক্সাটাকে টেনে সাবধানে সাঁকোর উপর উঠাতে  
লাগলো। চাকাগুলো মাপমতো না থাকলে রিক্সা খালে পড়ে যাবে। খালের মধ্যে সাঁকোর ঠিক নীচে বসে বুড়ো মতো একটা লোক তিন  
কাঠি দিয়ে আটকানো একটা জাল পেতে বসে আছে দেখলাম। মাকে দেখলাম তার কাছে গিয়ে আলাপ জুড়ে দিতে। মামা বাড়ি আসলে  
মা পুরো নোয়াখালির ভাষায় কথা বলে। সবটা না বুবালেও আমি অনেকটাই বুবাতে পারি। শুনতে শুনতে শেখা হয়ে গেছে। মাকে বলতে  
শুনলাম, কি গো উপি কাকা, আইজ বেয়ালে মাছ উঠছে নি? কিছু হাইছেন নি?

হ, উঠছে কিছু। তুই আইবি হৃনছি আই। তই হিয়ার লাই বিয়ান্নেই মাছ কিছু বড়ো মারে দিয়া আইছি। উপি কাকা উন্নর দিলো। তুই  
ভালা আছস নি? আইতে কষ্ট হয় ন তো? বুবালাম এই বড়ো মা হলো বড়ো মা, মানে দিদিমা।

না, কাকা, কষ্ট হয় ন। আমনাগো জামাই হিয়ান তুন বাসে তুলি দিছে। আর বাস সিধা মাইজদি নামাই দিছে। কোন অসুবিধা হয় ন  
আমনেগো আশীর্বাদে। মা উন্নর দিলো।





ବୋଡ଼ଗାରେ ତୋ ଚିନି । ଲଗେ ଛୋଡ଼ଗା, ତୋର ମାଇୟା ନି? ଉପି କାକା ଜିଜ୍ଞେସ କରଲୋ । ବୁଝଲାମ ଆମାକେ ନିଯେ କଥା ହଚ୍ଛେ ଏଥନ ।  
ହକାକା । ଇଗା ଆର ମାଇୟା । କେଳାସ ଫାଇତେ ପଡ଼େ । ମା ବଲଲୋ ।  
ବଢ଼ ଅଇ ଗେହେ ଦେହି । ଦେଇଖିତେ ତୋର ମତହି ହଇଛେ । ଠାକୁରେ ତାରେ ବାଁଚାଇ ରାଖୁକ । ଉପି କାକା ଆଶୀର୍ବାଦ କରଲୋ ଆମାର ଜନ୍ୟେ ।  
ଆଇଛା କାକା । ଭାଲା ଥାକିଯେନ । ଆମରା ଅନ ଯାଇଯେର । ଆବାର ଦେଖା ଅଇବ ।  
ରିଙ୍ଗା ଦୁଟୋଇ ତତକ୍ଷଣେ ସାଂକୋ ପାର ହୟେ ଓପାରେ ଗିଯେ ଥେମେହେ ।

ସାମନେ ହାତେର ଡାନ ଦିକେ ବଡ଼ ପୁକୁରଟାର ପାଡ଼ ଦେଖା ଯାଚିଲ । ବଡ଼ା ବାବାର ପୁନ୍ଧରିଣୀ । ଆର ମାତ୍ର ଏକଟୁଖାନି ପଥ ବାକି । ଆମାର ଦାଦୁକେ ସବାଇ ଡାକେ ବେଡା ବାବା । ପୁକୁରଟା ଦାଦୁଇ ଖନ କରିଯେ ଛିଲେନ । ଏଥାନେଇ ବାଡ଼ିର ଛେଲେରା ଶାନ କରେ ଥାକେ । ମେଯେରୀ ଏବଂ ବାଡ଼ିର ଖୁଦେ ଛେଲେରା ଶାନ କରେ ବାଡ଼ିର ସାଥେ ଲାଗୋୟା ପୁକୁରଟାତେ । ଓଖାନଟାଯ ଏକଟୁ ନିରିବିଲି । ବାଇରେ ରାସ୍ତାର ସାଥେ କୋନ ଯୋଗାଯୋଗ ତାର ନେଇ ।  
ବଡ଼ ପୁକୁରଟା ପାର ହବାର ପର ରାସ୍ତାର ଦୁପାଶେ ଦେଖଲାମ ହରେକ ରକମ ଫୁଲ ଗାହେର ସାରି । ଚାଁପା, ହୁଲପଦ୍ମ, ବକୁଳ, କାମିନୀ, ଅଶୋକ, ନାଗଲିଙ୍ଗମ ଫୁଲେର ଗାଛ ଆହେ ଦେଖେଛି । ମା ଇଚିନିଯେ ଦିଯେଛିଲ ଗତବାର । ଶିଉଲି ଫୁଲେର ଗାଛଓ ଆହେ । ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ଆମି ନିଜେଇ ଚିନିତେ ପେରେଛିଲାମ ଦାଦୁର ହାତେର ଲାଗାନୋ ଗାଛ ସବ । ଦାଦୁର ସ ଖ ଛିଲ ଫୁଲ ଗାହେର । ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଥେକେ ଲୋକ ଲାଗିଯେ ଗାଛ ଆନିଯେ ଲାଗିଯେଛିଲେନ । ଲାଗିଯେଛିଲେନ ନିଜେର ବାଡ଼ିତେ ନୟ, ରାସ୍ତାର ଧାରେ ଯାତେ ପାଡ଼ାର ସବାଇ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରତେ ପାରେ । ଦାଦୁ ଏଥନ ନେଇ ତବେ ଗାହୁଙ୍ଗଲୋ ଆହେ । ଦାଦୁର କଥା ବଲେ । ଦାଦୁ ରୋଜ ଫୁଲଗାହୁଙ୍ଗଲୋର ଗୋଡ଼ାତେ ଜଳ ଦିତେନ । ଶୁଣେଛି ଶାନ କରା ଶେଷେ ଦାଦୁ କଥନୋ ପୁକୁର ଘାଟେ ମାଥା ମୁହଁତେନ ନା ବା କାପଡ଼ ଛାଡ଼ିତେନ ନା । ଭେଜା କାପଡ଼େଇ ବାଡ଼ିତେ ଚଲେ ଆସତେନ । ଆସାର ପଥେ ଭେଜା କାପଡ଼ ନିଂଡେ ଫୁଲ ଗାହୁଙ୍ଗଲୋର ଗୋଡ଼ାତେ ରୋଜ ଜଳ ଦିତେ ଆସତେନ ।

ତତକ୍ଷଣେ ଦେଖଲାମ ଆମାଦେର ଆସାର ଖବର ଚାଟିର ହୟେ ଗେହେ । ଆମାଦେର ରିଙ୍ଗାଙ୍ଗଲୋ ବାଡ଼ିର ଉଠାନେ ବୈଠକଖାନାର ସାମନେ ଏସେ ଥାମାର ଆଗେଇ ଦେଖଲାମ ଉଠୋନ ଭର୍ତ୍ତି ହୟେ ଗେହେ ଲୋକେ । ଆହମେଦ ଚାଚାକେ ଦେଖଲାମ ସବାର ଆଗେ ଏଗିଯେ ଆସତେ । ଏସେ ଏକ ଗାଲ ହେସେ ମାକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲୋ, ଭାଲା ଆହେନ ନି, ଦିଦି?

ଭାଲାଇ । ବଲେଇ ଚାଚା ଛୋଟା ମାରାର ମତୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକେସଟାକେ ଉଠିଯେ ନିଯେ ବାଡ଼ିର ଭେତରେ ଚଲେ ଗେଲୋ ।

ମାମାବାଡ଼ିଟି ଦୋତଳା । ପାକା ଇଟେର ବାଡ଼ି । ବନ୍ୟାର କଥା ଭେବେ ବୋଧ ହୟ ଏକଟୁ ଉଚ୍ଚତେ ତୈରୀ । କଯେକ ଧାପ ସିଁଡ଼ି ବେଯେ ଉଠେ ଭେତରେ ଯେତେ ହୟ । ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରେର ବାମ ପାଶେ ମାଧ୍ୟମୀ ଲତାର ଝାଡ଼ । ବାଡ଼ିର ଛାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେ ଗେହେ । ସିଁଡ଼ିଙ୍ଗଲୋ ସିମେନ୍ଟ ବାଁଧାନୋ । ତାରଇ ସବଚାଇତେ ଉପରେର ଧାପେ ଦେଖଲାମ ମେଜମାସୀ ତାର ଇଯା ମୋଟା ଶରୀର ନିଯେ ବସେ ଆହେ । ମା ଏବଂ ମାସୀଦେର ମଧ୍ୟେ ଏହି ମେଜମାସୀଇ ସବଚାଇତେ ବେଶୀ ମୋଟା ଏବଂ ବେଶୀ ମଜାର । କୌତୁକ କରତେ ପଚନ୍ଦ କରେନ । ଯେଟା ସବ ଚାଇତେ ଭାଲୋ ପାରେନ ତା ହଲୋ କାଉକେ ନକଳ କରେ ଦେଖାତେ । ଯାକେ ନିଯେ ନକଳଟା କରେ ସେ ଛାଡ଼ା ବାକି ସବାର ତଥନ ହାସତେ ହାସତେ ପେଟେ ଖିଲ ଧରେ ଯାବାର ଯୋଗାଡ଼ ହୟ । ମାସୀ ଓଥାନ ଥେକେଇ ଆମାଦେର ଦିକେ ତାକିଯେ ହାସଛିଲେନ । ବୁଝଲାମ, ମାସୀ ନଟ ନଡନ ଚଢ଼ନ । ଚୋଖା ଚୋଖି ହତେଇ ଆମି ହାତ ନାଡ଼ିଲାମ । ଦିଦିମା ମାମୀ ଉଠୋନେଇ ଛିଲେନ । ଆମି ଏଗିଯେ ଗିଯେ ଚିପ କରେ ତାଦେର ପ୍ରଣାମ ସେରେ ନିଲାମ । ଆମାର ଆର ଅପେକ୍ଷା ସହିଛିଲେ ନା । ଆମାର ଲୋକଜନ ଉଠୋନେ ଦାଁଡିଯେ ଆହେ ତାରା ଆମାର ଜନ୍ୟେ ଆମାର ମତୋଇ ଅଧିର ହୟେ ଅପେକ୍ଷା କରଛେ । ଆମାର ଲୋକଜନ ମାନେ ମିଲୁ ଦାଦା, ତୁତୁ ଦାଦା, ମୁଖା ଦିଦି, ସୈକତ ଦାଦା, ବୁଲାନ ଦାଦା, ରାଜୁ ଦାଦା, ହାବୁଲ ଆର ଅଞ୍ଜଲୀ । ଏକମାତ୍ର ହାବୁଲ ଆର ଅଞ୍ଜଲୀ ଛାଡ଼ା ବାକିରୀ ଆମାର ଚାଇତେ ବସେ କିଛୁ ବଡ । ହାବୁଲ ଅଞ୍ଜଲୀ ଖୁବୁତୁତୋ ଜ୍ୟୋତୁତୋ ଭାଇ ବୋନ । ଆମି ଉଠାନେର ଚାର ପାଶେ ତାକାଲାମ । ଆମରା ତଥନ ବୈଠକଖାନାର ସାମନେ ଦାଁଡାନୋ । ଭେତରେ ତାକାଲାମ ସେଖାନେ କେଉ ନେଇ । ତାର ଉଲ୍ଲୋଦିକେ ରାନ୍ଧାଘର । ମାମୀ କାଜେର ମହିଳା ଏକଜନକେ କିଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଚେନ । ହାବୁଲ ନେଇ । ତାର ବାମ ପାଶେ ଏକଟୁ ଦୂରେଇ ରାଧା ମାଧ୍ୟବେର ନାଟମନ୍ଦିର । ଓଥାନେ ନେଇ ହାବୁଲ । କଲତଳା ତୁଳସୀ ବେଦୀ ଫାଁକା । ହାବୁଲ ନେଇ । ରାନ୍ଧା ଘରେର ପେଛନେ ପୁକୁରେର ଏକଟୁ ଅଂଶ ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲୋ । କୋନ ଚେଟୁ ନେଇ । ମାନେ ସେ ପୁକୁରେଓ ନେଇ । ଆମି ସବାର ଦିକେ ତାକିଯେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲାମ ହାବୁଲ, ହାବୁଲ କୋଥାଯା?

ଠିକ ତଥନଇ ଆମାର ଗାୟେ ଏକ ରାଶ ଠାର୍ଡା ଜଳ ଏସେ ପଡ଼ିଲୋ । ଆମି ତାଙ୍କ କରେ ଲାଫିଯେ ଉଠିଲାମ । ଆକାଶେ ମେଘେର ନାମ ନେଇ ହଠାତ କରେ ବୃକ୍ଷ କୋଥେକେ ଆସବେ? ଆମି ଉପରେର ଦିକେ ତାକାଲାମ । ଦେଖଲାମ ବୈଠକଖାନାର ଲାଗୋୟା ବଡ଼ ଲିଚୁ ଗାହୁଙ୍ଗାର ଏକଟା ଡାଳ ଯେଟା ଉଠୋନେର ଦିକେ ଏସେହେ ତାରଇ ଉପରେ ହାବୁଲ ବସେ ଆହେ ହାତେ ପିଚକାରୀ । ଆମି ତାକେ ମାରାର ଜନ୍ୟେ ଏକଟା କିଛୁ ଖୁଜିତେ ଲାଗଲାମ । ହାବୁଲକେ ଧରତେ ନା ଗିଯେ ସବାଇ ତଥନ ଆମାକେ ନିଯେ ହାସାହାସି କରିଛିଲ । ଆମି ବୁଝଲାମ ଏତେ ସବାରଇ ସାଯ ଆହେ । ଏରା କେଉଠି ଏଥନ ଆମାକେ ସାହାୟ କରବେ ନା । ନିଜେଇ ଏକଟା ଲାଟି ଖୁଜେ ନିଯେ ଯତକ୍ଷଣେ ଆମି ହାବୁଲକେ ମାରତେ ଗୋଲାମ ହାବୁଲ ତତକ୍ଷଣେ କାଠବେଡ଼ାଲୀର ମତୋ ଉଧାଓ ହୟେ ଗେହେ ।

ଶ୍ରାଦ୍ଧାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ କରେ ଦୁପୁରେର ଖାଓୟାଟା ଏକଟୁ ଦେଇତେଇ ହଲୋ । ବାଡ଼ିତେ ଦାଦୁର ଏକ ଦୂର ସମ୍ପର୍କେର ଭାଇ ଥାକିତେନ । ଦାଦୁର କୋନ ଭାଇ ବୋନ



ছিল না। উনাকেই দাতু ভাইয়ের মতো আদর করে রেখেছিলেন। শান্তানুষ্ঠান দাতুর সেই ভাইয়েরই। দিদিমা সবাইকে এই দিনে বিশেষ নিমত্তন করে আসতে বলেছিলেন।

বাড়ীর সবাই আমরা কলাপাতায় করে সারি করে বেতের আসনে বসে খেলাম। দিদিমা নিজেই তদারকি করলেন। দিদিমারা একে বলেন পংক্তি ভোজন। রান্নাঘরের এক কোণায় পুরু পাড়টায় যে খানটায় ছাই ফেলা হয় সেখানটাতে কলাগাছের বিশাল এক বাঢ় আছে। বুবলাম একটা বাড় গেছে সেখানে। পাতাগুলো সেখান থেকেই এসেছে।

খেতে বসার আগেই হাবুলের সাথে যথারীতি আবার ভাব হয়ে গিয়েছিল আমার। হাবুলই আমাকে জানালো, জানিস সন্ধ্যেয় বকুলদা আসবেন।

শুনে আমিও লাফিয়ে উঠলাম। বকুলদা আসবেন সত্যি?

হাঁ, মা বলেছে। হাবুল বললো।

বকুলদা আসবে শুনে আমি খুব উত্তেজিত বোধ করছিলাম। বকুলদা এলে সান্ধ্য আসরটা খুব জমবে। গেল বার আমি যখন মামাবাড়ি এসেছিলাম তখন বকুলদার সাথে পরিচয় হয়েছিল। বকুলদা অঞ্জলীর বড় দিদি দীপালিদির বর। মামাদের বৈঠকখানায় বসে অনেক রাত অবধি আড়ডা জমেছিল আমাদের। মজার মজার সব গল্প। ঠিক গল্প নয় তবু মনে হয় গল্পই। আমার মনে পড়লো টিটিকাকার গল্প। আসবের মাঝখানে বকুলদা হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রামের মেজকাকা লঙ্ঘনে, সেজকাকা প্যারিসে, তাহলে কেউ কি বলতে পারিস টিটিকাকা কোথায়? আমরা সবাই মাথা চুলকাচ্ছিলাম। আমি রামকে নিয়ে একটা ধাঁধা শিখেছিলাম এর কিছুদিন আগেই। ধাঁধাটা ছিলো এরকম। রামেরা চার ভাই। তাদের একজনের নাম শরত, আরেক জনের নাম হেমন্ত আর অন্য জনের নাম বসন্ত। তাহলে বাকী জনের নাম কি? উত্তর হবে রাম। আমি ভেবেছিলাম রামের ধাঁধা যখন তখন উত্তর নিশ্চয়ই একই হবে। তাই তাড়াতাড়ি চালাকি করে বলে ফেলেছিলাম, উত্তর হবে রাম। সবার সে কি হসি। শুধু মিলু দাদা গন্তীরভাবে বলেছিল, ভুল হয়া। মিলু দাদা কিছু দিন দিল্লীতে কাটিয়ে সম্পত্তি দেশে ফিরেছিল। কথায় কথায় দু চারটা হিন্দী বাত তখন তার বাতিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেও প্রশঁটার উত্তর দিতে পারলো না। হাবুলটা বুদ্ধি পাকাচ্ছিল। সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফের একটা প্রশ্ন করে বসেছিল। টি টি মানে ইংরেজীর অক্ষর টি টি? আমাদের এক স্যার আছেন। নাম নাম টিটি স্যার। ভালো নাম তমাল তরু সংক্ষেপে টিটি। আমাদের পিটি করান। না পারলে ধরে খুব পিটান। আমরা তাই বলি টিটি পিটি পিটাপিটি। সেই রকম টিটি?

না। সেই রকম কিছু নয়। স্যার দের নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে, না?

হাবুল ভুলেই গিয়েছিল জামাইবাবু বকুলদাও একজন স্যার। রীতিমত হেতু স্যার। সে তৎক্ষণাত নিজের দুকান দু হাতে ধরে জিভ কামড়ে বলেছিল, ভুল হয়া স্যার।

আর এক দফা হসির রোল উঠেছিলো। কিন্তু প্রশঁটার উত্তর মিললো না। তুতু দাদাকে লক্ষ করছিলাম কিছু একটা বলার জন্যে উসখুস করছিলো। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো, তাহলে কি ট্রেনের টিটি হবে?

না তাও নয়। তবে কথাটা টিটি নয়। টি টি ই। বকুলদা বলেছিলো। ট্রেন টিকেট একজামিনার। তোদের ওই সংক্ষেপে আরকি।

ফির ভি ভুল হয়া। মিলু দাদা আবার বললো।

এবার কেউ আর হাসলো না। আমি বললাম কোন রামের কথা বলা হচ্ছে সেটাই যখন জানিনা তখন তার কোন কাকা কোথায় থাকে কি করে জানবো?

এক দম ঠিক কথা বলেছিস। সবাই প্রায় সমস্তেই বলে উঠেছিল। আমি বকুলদাকে বলেছিলাম, তুমই বলে দাও না দাদা। আমরা কেউ পারবো বলে মনে হচ্ছে না।

বকুলদা তখন বলেছিল, এত সহজে হাল ছেড়ে দিলি? রামের কাকারা তাদের যেখানে খুশী থাকুক না। আমাদের বলার কি আছে। তবে টিটিকাকা আগে যেখানে ছিল এখনো সেখানেই আছে। ভবিষ্যতেও সেখানে থাকবে যদি দুনিয়া উল্টানোর মতো কিছু না ঘটে। টিটিকাকা হচ্ছে একটা হৃদ। পৃথিবীর সর্বোচ্চ হৃদ। ভুগলে পড়িস নি? মানচিত্র খুলে দেখে নিস দক্ষিণ আমেরিকার পের আর বলিভিয়ার মাঝে আছে হৃদটা। ভুপৃষ্ঠ থেকে বার হাজার পাঁচশো সাত ফুট উপরে তার অবস্থান। বুবলি এবার? বুবলাম, দাদা বোকা বানিয়েছে। আমরা রামের আত্মীয় স্বজন নিয়ে টানাটানি করছি আর প্রশঁটা কি না ভুগলের।

তারপর বকুলদা মিলুদার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিলু, তুই কি জানি বলছিলি? ও ভুল হয়া। জানিস আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগে মিথিলার রাজা আমাদের এই এলাকাতে এসে ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন। তবে তোর মতো ঠাট্টা করে নয়। রীতিমত আর্তনাদ করে কেঁদে বলেছিলেন।

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমরা তখন আরো একটু ঘন হয়ে বসেছিলাম। কিছুই বলতে হলো না দাদা নিজে থেকেই বলতে থাকলেন।

হাঁ, কথাটা বলেছিলেন রাজা বিশ্বন্তর সুর। মিথিলার রাজা আদি সুরের নবম পুত্র। তিনি এসেছিলেন তীর্থ যাত্রায়। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের চন্দনাথ মন্দিরে। বাহান শক্তিপীঠের এক পীঠ সেটা। আমিও একবার সেখানে গিয়েছিলাম। মন্দিরটা চন্দনাথ পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। তীর্থ শেষে ফিরেছিলেন তিনি তাঁর সুরম্য বজরায়। সাথে লোক লক্ষ পাইক পেয়াদা। রাজা বলে কথা। তা ছাড়া



লুটপাটের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। রাতে স্বপ্ন দেখলেন তিনি। কুলদেবী বরালী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলছেন, আমার নামে বলি দে এখানে। তোর হবে। রাজা হবি তুই এখানের। ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো তাঁর। ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন তিনি। ভাবতে লাগলেন এ সবের মানে কি। দেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁর। আদেশ দিলেন, এখানেই নোঙর ফেল। দেবী বরালীর পূজার আয়োজন করতে হবে। পাঁঠা বলি দিতে হবে। নিখুঁত নধর পাঁঠা চাই।

নোঙর পড়লো সেখানেই। তোর হতেই তাঁর লোকজন ছুটাচুটি করে আশে পাশের এলাকা থেকে পূজার সামগ্রী সব যোগাড় করে ফেললো। নধর নিখুঁত পাঁঠাও আনা হল।

সেদিন ছিল মেঘ ঢাকা আকাশ। দুর্ভেদ্য কুয়াশা ও নেমেছিল। সামনে দাঁড়ানো কাউকে দেখা গেলেও চেনা যাচ্ছিল না। সূর্যদেবকে মেঘ ঝাপটে ধরে রেখেছিল, কিছুতেই বের হয়ে তাকে মুখ দেখাতে দেবে না। এদিকে পূজোর সময় পার হয়ে যাবে যাবে। রাজা আদেশ দিলেন, বলি দেয়া হোক। নিয়ম মেনে যুপকাঠে পাঁঠাটাকে বাঁধা হলো। ধারাল খড়া নেমে এসে এক কোপেই পাঁঠার মাথাটাকে ধড় থেকে আলাদা করে দেয়া হল নিয়ম মতোই। পাঁঠার মাথাটা মাটিতে পড়ে যখন গড়াগড়ি খাচ্ছিল ঠিক তখনই মেঘ সরে গিয়ে সূর্যদেবকে সামনে ঠেলে দিয়েছিল। রাজা দেখলেন যুপকাঠে পাঁঠার মাথাটা বাঁধা হয়ে ছিল পশ্চিম দিক করে যে দিকে মাথা রাখার নিয়মই নেই। রাজা আর্তনাদ করে উঠে বলেছিলেন, ভুল হয়া। সেই থেকে জায়গাটার নাম হয় ভুল হয়া। লোকমুখে সেটা হয়ে যায় ভুলয়া। আমাদের আজকের নোয়াখালী। ঘটনাটা বারশো তিন সালে ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়।

আমরা অনেকক্ষণ স্তুত হয়ে বসেছিলাম। সম্ভিত ফিরে পেতে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তবে নোয়াখালী কি করে হলো? ভুলয়া থেকে নোয়াখালী ঠিক মিলছেকি?

বকুলদা বলেছিল, সে আরেক কথা। ডাকাতিয়া নদীর প্লাবনে প্রায়শই ফসল নষ্ট হতো তখন। সেই প্লাবন ঠেকাতে গিয়ে নতুন একটা খাল খনন করা হয়েছিল ঘোলশ ষাট সালে। ডাকাতিয়া থেকে টানা খালটা রামগঞ্জ, সোনাইমুড়ি চৌমুহনী হয়ে মেঘনা আর ফেনী নদীর সংগমে গিয়ে পড়েছে। নোয়া মানে নতুন। নোয়া খালের এলাকা তাই আবার নতুন নাম হয় নোয়াখালী। ভুলয়া নামটা কালে কালে ঢাকা পড়ে যায়। তবে হ্যাঁ ভুলয়া নামের একটা গ্রাম এখনো কিন্তু আছে আমাদের এখানে।

কিরে কি ভাবছিস? বলে হাবলু আমার চোখের সামনে হাত নাড়াল। হাবলুর কথাতে আমি আবার বাস্তবে ফিরে এলাম।

উত্তরে বললাম, ভাবছিলাম বকুলদা এবার কিসের গল্প বলবে?

কোন কোন দিন সন্ধ্যা খুব দেরীতে নামে। আজও তেমনই একটা দিন মনে হচ্ছিল।

হাবলু আমি আর অঞ্জলী এক সাথেই ঘুর ঘুর করছিলাম। মামার সাথে মুখো মুখি হয়ে গেল। মামা আমাদের দেখে বললেন, কি রে হৃষী মাক্ষেত্যার্স উইথ নো মাস্ক নো টিয়ার্স, বেশ আড়ত হচ্ছে দেখি। এবার আমার দিকে চোখে চোখ রেখে বললেন, তোর মাকে বলে দিস, তোদের পোঁচানোর সংবাদ তোর বাবাকে আমি জানিয়ে দিয়েছি।

বাড়ির চার পাশে আম নারকেল সুপারির গাছ দূর থেকেই যা চোখে পড়ে। আভিনার কাছে আছে সব বনজ ও মুখের গাছ। তুলসীর ঝোপ, সর্পগন্ধা, ঘৃতকুমারী, থানকুনি, বাসক, বেল, নিম কি নেই! বিভিন্ন ধরণের ছত্রাকও আছে। দাদু বলতেন বলে শুনেছি গাছকে চিনতে হয় জানতে হয়। নইলে মানুষ বাঁচাবে কি করে। রোগ যেমন আছে তার নিদানও আছে। শুধু সঠিক জ্ঞানটা থাকা দরকার। দাদু নিজে কবিরাজ ছিলেন। বাজারে আয়ুর্বেদিক দোকান করেছিলেন। চিকিৎসা করতেন। মাইজন্ডি নেমে গঙ্গাপ্রসাদ ঔষধালয় বললে যে কেউ দেখিয়ে দেবে দোকানটাকে। মামা ও দাদুর ব্যবসাটাকে ধরে রেখেছেন। ওই সব লতা পাতা থেকেই বানান হয় দোকানের ওষুধগুলো।

সন্ধ্যে তখন হবে হবে। মামা উঠোনে হ্যাজাক লাইট জালিয়ে দিলেন। পুরো উঠোন উজ্জ্বল আলোতে ভরে উঠেছিল। আমরা ছোটো হ্যাজাক লাইটটার চারপাশ ধিরে মামার হ্যাজাক লাইট পাম্প করাটা দেখছিলাম। এমন সময় শুনলাম বড়ো বাবার পুকুরগীর দিক থেকে কে যেন বাঁশী বাজাতে বাজাতে আসছে। অন্য ধরণের বাঁশীর শব্দ সেটা। কিছুটা হইসেলের মতো।

আমি হাবলুকে বললাম, শুনছিস?

হাবুল লাফ দিয়ে উঠলো শুনে। মাটির কোকিল বাঁশী। বকুলদা এসে গেছে। চল। বলেই সে পুকুরের দিকে দৌড় দিলো। আমি আর অঞ্জলীও তার পিছু পিছু ছুটলাম। সততই বকুলদা! পরণে আগের মতোই লশ্ব খন্দরের পাঞ্জৰী সাদা পায়জামা। বাম কাঁধে বুলানো কাপড়ের সেই ব্যাগ। পায়ে একজোড়া বাদামী রঙের চামড়ার স্যাভাল। ঠিক আগের মতোই আছে সব কিছু। কিছুই বদলায় নি। তবে এবার হাতে তার পাখীর মতো দেখতে মাটির একটা খেলনা বাঁশী যা গতবার দেখিনি। হাবলু ঠিকই ধরে ফেলেছে। বকুলদাই বাঁশী বাজাচ্ছিলেন।

মাথা নীচু করে প্রণাম করে দাদাকে প্রণাম করতে গিয়ে খটকা লাগলো একটা। হাবলু কি করে বুঝলো বকুলদা এসেছে? আমি বুঝিনি অঞ্জলীও বোঝে নি। আমি না হয় গ্রামে থাকি না অঞ্জলীতো থাকে।

বকুলদা সবাইকে জড়িয়ে ধরলেন।

অঞ্জলী জিজ্ঞেস করলো, দিদি আসে নি?

বকুলদা বললো, আসতে পারে নি। কাউকে বলবি না এখন, তোর দিদির বাচ্চা হবে। তাই আসতে পারে নি। শুনেই অঞ্জলী বাড়ির দিকে



ଦୌଡ଼ ଦିଯେଛିଲ ।

ବକୁଳଦା ହେସେ ବଲେଛିଲ, ଦେଖ କତ ଦ୍ରୁତ ସବାର କାହେ ଖବରଟା ପୋଛେ ଦିଲାମ ।

ସତିଇ ତାଇ । ଆମରା ଉଠୋନେ ଢୁକେଇ ବୁଝତେ ପାରଲାମ ସୁଖବରଟା ସବାଇ ଜେନେ ଗେଛେ । ଦିଦି ନା ଆସତେ ପାରାର କାରଣ୍ଟା ଆର ଦାଦାକେ ଜନେ ଜନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ହଲୋ ନା ।

ହ୍ୟାଜାକେର ଆଲୋତେ ପଂକ୍ତି ଭୋଜନେର ସମୟ ଦିଦିମା ବଲଲେନ, ଏଟାଇ ଜଗତେର ନିୟମ ଏହି ଆସା ଯାଓୟା । ପୁରାତନରା ଯାବେ ନତୁନରା ଆସବେ । ଆମରା ସବାଇ ଏକଦିନ ଚଲେ ଯାବୋ ଓହି ଦାଦୁଦେର ମତନ । ଶରୀର ତୋ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର । ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ଵର । ମୃତ୍ୟୁର ପର ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ ହେଡ଼େ ନତୁନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ ମାତ୍ର । ତବେ କଥନ କୋଥାଯ ଗିଯେ କୋନ ବସ୍ତ୍ର ପରବେ କେଉଁ ଜାନତେ ପାରେ ନା ଏହି ଯା ।

ହାଓୟାଟା ଏକଟୁ ଭାରୀ ହେୟ ଉଠେଛିଲ ଦିଦିମାର କଥାତେ । ସେଟା ଲାଘବ କରତେଇ ବକୁଳ ଦା ବଲେ ଉଠିଲୋ, ଜାନୋ ଦିଦିମା, ଆମେରିକାର ମ୍ୟାସାଚୁରେଟେ ମ୍ୟାକ ଡ୍ୟଗାଲ ନାମେ ଏକ ଡାଙ୍କାର ଉନିଶଶ୍ରୋ ସାତ ସାଲେ ଆତ୍ମାର ଓଜନ ମାପାର ଚେଷ୍ଟା କରେଛିଲେନ । ମୃତ୍ୟୁର ଆଗେ ଏବଂ ପରେ ଛୟ ଜନ ରୋଗୀର ଶରୀରେର ଓଜନ ମେପେ ଦେଖେଛିଲେନ ତିନି । ତିନି ଦେଖେଲେନ ଶରୀରେର ଓଜନ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ପ୍ରାୟ ଏକୁଷ ଗ୍ରାମେର ମତୋ କମେ ଯାଯ । ସେଟାଇ ଆତ୍ମାର ଓଜନ ବଲେ ତିନି ଦାବୀ କରେଛିଲେନ । ତାଁର ଦାବୀ ଅବଶ୍ୟ ପରେ ଧୋପେ ଟେକେନି ।

ଏବାର ଆମାଦେର ଦିକେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କରେ ବଲଲେନ ଜାନିସ, ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ୍ ଓ ଆତ୍ମା ନିୟେ ପରିକ୍ଷା କରେଛିଲେନ । ଉଠି ଆତ୍ମାର ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗେର ଜନ୍ୟ ପ୍ଲ୍ୟାନଚେଟ୍ କରେଛିଲେନ ।

ପ୍ଲ୍ୟାନଚେଟ୍ କି? ଆମି ବୁଝାତେ ନା ପେରେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲାମ । ତୁମି ଦେଖେଛ କାଉକେ କରତେ?

ଓହ ତୁଇ ଜାନିସ ନା ବୁଝି । ବକୁଳଦା ବଲଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆଜକେ ରାତେ ନା ହ୍ୟ ଆମରା ପ୍ଲ୍ୟାନଚେଟ୍ କରବୋ । ଆତ୍ମା ନାମାବୋ । ଭୟ ପାବି ନାତୋ? ମାଝେ ମାଝେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରା ଓ ଚଲେ ଆସତେ ପାରେ । ତଥନ ବାମେଲା ହତେ ପାରେ ।

ଆମାର ତଥନ ସତିଇ ତମ ଲାଗଛିଲ । ବାମେଲା ମାନେ କି? କି ହତେ ପାରେ? ତବୁ ଓ କେଉଁ ଯଥନ ଭୟ ପାଛେ ସ୍ବିକାର କରାଇଲୋନା ଆମିଇ ବା କରି କେନ । ବଲଲାମ, ନା । ଆମି ଦେଖବୋ ତୋମାର ପ୍ଲ୍ୟାନଚେଟ୍ କରା ।

ବକୁଳଦା ଶୁଦ୍ଧରେ ଦିଲେନ କଥାଟାକେ । ଆମାର ନୟ, ଆମାଦେର । ଆମାଦେର ଅନେକକେ ଥାକତେ ହବେ, ତାହଲେ ଡାକାର ଜୋରଟା ବାଡ଼ବେ । ଆତ୍ମାରା ତଥନ ନା କରତେ ପାରବେ ନା । ପ୍ଲ୍ୟାନଚେଟ୍ କରା ଦେଖିତେ ଚାଇଲେ ଝଟପଟ ଏକଟା ପେନ୍ଦିଲ, ଚାରକୋଣା ଏକଟା କାଗଜ ଆର ଏକଟା ଗ୍ଲାସ ଯୋଗାଡ଼ କରେ ନିବି ଖାଓୟାର ପରେ । ଆମି ଦେଖି ତିନ କୋଣା କୋନ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରତେ ପାରି କି ନା । ବୈଠକଖାନାତେଇ ଆମରା ବସବୋ । ଠିକ ଆଛେ? ଏଥନ ସବାଇ ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ଖେଯେ ନେ ଦେଖି ।

ଆମାର ଖାଓୟା ତଥନ ମାଥାଯ ଉଠେ ଗିଯେଛିଲ । ଗ୍ଲାସ ପେନ୍ଦିଲ କାଗଜ ନିୟେ କଥନ ଯେ ବୈଠକଖାନାଯ ହାଜିର ହବ ସେଟାଇ ଛିଲ ଭାବନା । ଖାଓୟା ଶେଷ ହତେଇ ଆମି ତୁତୁ ଦାଦାକେ ବଲଲାମ କାଗଜ ଆର ପେନ୍ଦିଲ ଯୋଗାଡ଼ କରତେ । ଆମି ନିଜେ ମାମୀର କାହ ଥେକେ ଏକଟା କାଁଚେର ଗ୍ଲାସ ଚେଯେ ନିଲାମ । ବକୁଳଦା ପାଶେର ବାଢ଼ିଟାତେଇ ତାଁର ଶୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଢ଼ିତେ ଚଲେ ଗିଯେଛିଲେନ । ଓଖାନ ଥେକେଇ ହାବୁଲକେ ଡାକ ଦିଲେନ, ହାବୁଲ, କାକାର କାହ ଥେକେ ଛୋଟ କରାଟଟା ନିୟେ ଆୟ ତୋ । ତିନ କୋଣା କାଠ ପାଓୟା ଯାଛେ ନା । ତଙ୍କାର ଏକଟା ପାଶ କୋଣା କୁଣି ଭାବେ କେଟେ ନେବୋ ଠିକ କରେଛି । ତାତେଇ ତିନ କୋଣା କାଠ ହ୍ୟେ ଯାବେ । କରାଟଟା ନିୟେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଆୟ । ହାବୁଲ ମାମାର କାହ ଥେକେ କରାତ ନିୟେ ବକୁଳଦାକେ ଦିତେ ଚଲେ ଗେଲ ।

ବୈଠକଖାନାଟାଯ ଏଥନ ସବାଇ ହାଜିର । ସବାଇ ମାନେ ଅଞ୍ଜଲୀ, ହାବୁଲ, ଆମରା ଭାଇ ବୋନେରା ଆର ବକୁଳଦା । ବୈଠକଖାନାଟା ଓ ମୂଳ ଘରେର ମତୋଇ ମାଟି ଥେକେ ଏକଟୁ ଉପରେ । ମାଟିର ଦାଓୟା, ଚାରପାଶେ ବେଡ଼ା ଦିଯେ ଦେଯାଲ । ଟିନେର ଚାଲ, ଛାଦଟା ଓ ବେଡ଼ାର । ଛାଦଟା ଶୁଦ୍ଧ ଛାଦ ନୟ ଛୋଟ ଖାଟ ଏକଟା ଗୁଦାମ ଓ ବଟେ । ଲତା ପାତା ଗାଛେର ଛାଲ ଶିକଡ ଓ ଶୁଦ୍ଧେର ଉପକରଣ ସବ ସେଖାନେ ରାଖା ହ୍ୟ । ଲିଚୁ ଗାଛଟାର ଓଦିକେ ଛାଦେ ଯାବାର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ଜାନାଲା କାଟା ଆଛେ । ମହି ଦିଯେ ଉଠେ ସେଖାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ରାଖା ହ୍ୟ । ଲିଚୁ ଗାଛ ବେଯେ ଓ ସେଖାନେ ଟୋକା ଯାଯ । ଲୁକୋଚୁରି ଖେଲତେ ସେ ଆର ହାବୁଲ ଏକବାର ଲୁକିଯେଛିଲ ସେଖାନେ । ସବ କଟା ବେଡ଼ାଯ ଆଲକାତରା ଲାଗାନେ ତାଇ ଦେଯାଲଗୁଲୋ କାଲୋ । ଘରେର କୋଣାଯ ଏକଟା ଖାଟ । ଉପରେ ପାଟି ବିଚାନୋ । ଖାଟେର ନୀଚେ ଅନେକ ଗୁଲୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋତଳ । ଘରେର ମାବାଖାନେ ଏକଟା ବଡ଼ ମଜବୁତ ଟେବିଲ । ଭାରୀ କୋନ କାଠେର ହବେ । ସାତ ଆଟଟା ଚୟାର ତାର ପାଶେ । ଏଥାନେଇ ଏକସମୟ ଦାଦୁ ବସନ୍ତ । ରୋଗୀର କଥା ଶୁନନ୍ତେ । ଏଥନ ମାମା ବସେନ । ସବସମୟ କବିରାଜି ଓସୁଧେର ଏକଟା ଗନ୍ଧ ପାଓୟା ଯାଯ ସରଟାତେ । ଟେବିଲେର କାହେର ଦେଯାଲଟାତେ ଏକଟା ବାଂଳା କ୍ୟାଲେଭାର ବୋଲାନୋ । ଓସୁଧେର ବିଜ୍ଞାପନେର ଛବି ଆଛେ ତାତେ । ଛବିର ବୋତଳେ ଲେଖା କୁଟ୍ଟାରାରିଷ୍ଟ । ଆମରା ଚୟାର ଗୁଲୋ ଦଖଲ କରେ ବସେଛି । ଟେବିଲେର ଉପର ଥେକେ ଏକଟା ଲର୍ଣନ ଝୁଲିଛି । ହାଲକା ଏକଟା ଆଲୋ ଛୁଟିଯେ ପଡ଼ିଛିଲ ତାର ଥେକେ । ଠିକ ତାର ନୀଚେଇ ଟେବିଲଟାର ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ଏକଟୁ ଗାଢ଼ ହ୍ୟେ ବସେଛି । ବକୁଳଦା ତାର ଉପରେ ଚାର କୋଣା କାଗଜଟା ଆର ପେନ୍ଦିଲଟା ତୁଲେ ରାଖିଲୋ । ଗ୍ଲାସଟା ଉପୁଡ଼ କରେ ରାଖିଲୋ କାଗଜେର ଉପରେ । ତିନ କୋଣା କାଠଟା ରାଖି ହଲୋ ତାର ପାଶେ । ଘରେ ଏଥନ ଯାକେ ବଲେ ପିନ ପତନ ନିଷ୍ଠକତା । ଲିଚୁ ଗାଛେର ଥେକେ ବାଦୁଡ଼ଦେର ପାଖାର ଝଟପଟାନି ଆର ବଗାଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ବେଶ ଶୋନା ଯାଛିଲ । ଆମର ଭୟ ଲାଗଛିଲ । କେମନ ଯେନ ଏକଟା ଗା ଶିର ଶିର କରା ଭାବ ।

ବକୁଳଦା ବଲଲୋ, ଆତ୍ମାରା ତୋ ନିଜେରା କଥା ବଲତେ ପାରେନା । ତାଇ ଏକଟା ମିଡିଯାମ ଦରକାର ହବେ ଯାର ମାଧ୍ୟମେ ସେ କଥା ବଲବେ । କେ ହବେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ? ଯେ ହବେ ସେଇ ପେନ୍ଦିଲଟାକେ ଧରେ ରାଖିବେ ।



আমরা এ ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম। কেউ সাহস পাচ্ছিলাম না। ঠিক এই সময় হাবুল বলে বসলো, আমার ভয় করছে এখানে। আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমি চলে যাবো।

চলে যাবি? বললেই হলো, আমরা এতগুলো লোক আছি না ঘরে। আমি খিঁচিয়ে উঠলাম।

না, আমার ভয় লাগছে। আমি কিছুই দেখতে চাই না। আমি চলে যাব। হাবুল কিছুতেই থাকতে চাইছিল না।

আসরটা মাটি হয়ে যাচ্ছিল দেখে আমি আরো রেগে গিয়ে বললাম, যা যা ভীতুর ডিম কোথাকার! যা মার কাছে গিয়ে দুধ খা গিয়ে।

শরীরে বল হবে। দাদা, আমরা আছি সে যাচ্ছে যাক। ওকে যেতে দাও।

হাবুল সত্তিঙ্গ বের হয়ে গেল ভয়ে।

মিডিয়াম কে হবে সেটা পাওয়া গেল না। আমি ও সত্যি বলতে কি হাবুলের মতোই ভয় পাচ্ছিলাম তবে স্বীকার করতে খুব জ্ঞান লাগছিল। তাছাড়া আমিই তো প্ল্যানচেট দেখতে চেয়েছিলাম।

বকুলদাই বাঁচিয়ে দিলেন। বললেন, ঠিক আছে। তলান্টিয়ার যখন পাওয়া গেল না তখন আমিই মিডিয়াম হচ্ছি। এবার তোদের নিয়ম বলে দিচ্ছি। তোরা সবাই এই ত্রিকোন কাঠটা ছুঁয়ে থাকবি। ওটা এখন প্ল্যানচেট বোর্ড। আমি তোদের ছুঁয়ে থাকবো। পেপ্সি আর কাগজ নিয়ে আমি তৈরী থাকবো লেখার জন্যে। উপুড় করা গ্লাসটা কাগজটাকে চেপে রাখবে। আমরা সবাই মনে মনে ছোট দাদু যার শান্তে আমরা এসেছি তাঁর কথা স্মরণ করবো। মনে মনে তার চেহারাটা কল্পনা করতে থাকবো। ধৈর্য হারালে চলবে না। মনে রাখতে হবে ওঁরা ইচ্ছেয় আসছেন না আমরা ডাকছি বলে দয়া করে আসছেন। আর তুই, আমার দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন, যখন বুবাতে পারবি যে আত্মা এসেছে তখনই গ্লাসটাকে সোজা করে দিবি। বুবলি।

আমি মাথা নেড়ে বোঝালাম বুবেছি। মুখ খুললেই যে আমি ভয় পাচ্ছিলাম সেটা ধরা পড়ে যাবে।

এবার প্রতীক্ষার পালা। চুপ করে আমরা ছোট দাদুর কথা ভাবছি। অবিরাম কিংবা পোকার ডাক শোনা যাচ্ছিল। বাদুড়গুলো বাগড়া করেই চলেছে। একবার অনেকগুলো শেয়ালও ডেকে উঠলো। কতক্ষণ পার হয়েছে মনে নেই হঠাৎ মনে হলো একসাথে অনেকগুলো বাদুড় লিচু গাছটা ছেড়ে উড়ে দূরে কোথাও চলে গেল। আমার শরীরে হিম স্নোত বয়ে গেল তবে কি কেউ আসছে। দাদুর আত্মাই কি? ঘরের ছাদ থেকে স্পষ্ট শব্দ শোনা গেল কেউ যেন হাঁটছে। আমার মনে পড়লো আমাকে এখন একটা কাজ করতে হবে। গ্লাসটাকে সোজা করে দিতে হবে। কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাসটাকে উল্টে দিলাম।

বকুলদা নির্দেশ দিলেন, কেউই এখন চোখ খুলবে না। কিছুতেই না।

ছাদের শব্দটা তখন থেমে গেছে। টেবিলে কোথাও যেন টপ করে এক ফোঁটা জল পড়লো। আরেকটা। আবার। এবার মনে হলো জলের ফোঁটাটা গ্লাসে এসে পড়ে।

বকুলদা বললো, দাদু তুমি এঁসেঁছো? উন্তরে ছাদে কেউ একটু হেঁটে বেড়াল। বকুলদার গলাটা এবার কেমন জানি খোনা খোনাল। এবার তোমরা চোঁখ খোঁলো। বকুলদা নির্দেশ দিলেন।

সেই সাথে সবার একটা আর্ত চিক্কার বেরিয়ে এল। আমারও। দেখলাম গ্লাস ভর্তি রক্ত। বকুলদা সেই গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিচ্ছেন। তার চোখ চুল চুলু যেন নেশাগ্রস্ত কেউ। কানে এলো কয়েকটা চেয়ার উল্টানোর শব্দ। উপরে কেউ যেন ফিক করে হাসলো। ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে তাহলে। আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখি আমি উঠানে। সারা গা জলে ভিজা। বকুলদা কল থেকে জল এনে আমার চোখে মুখে ছিটাচ্ছেন। মা মামা মাসী ভাই বোনরা আমার দিকে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

দিদিমাকে দেখলাম হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে। কি হয়েছেরে বকুল?

না, কিছুনা দিমা। বকুলদা বললো। একটু খানি ভয় পেয়েছে শুধু। সব ঠিক হয়ে গেছে।

আমার তখন মনে হচ্ছিল খুব ঘুম দরকার। বললাম, আমার ঘুম পেয়েছে।

পরদিন ঘুম ভাঙলো একটু দেরীতেই। হাবুলকে দেখলাম বসে আছে পাশে। আমি উঠতেই সে বললো উঠেছিস। নে মুখ হাত ধুয়ে নে। তার পর খাবি কিছু। আমি তোর জন্যে এক গ্লাস শরবত এনেছি।

জানিস হাবুল কাল রাতে.. আমি কিছু বলতে চাইলাম।

বললাম তো আগে হাতমুখ ধুয়ে নে। পরে গল্প করবো। হাবুল আমাকে থামিয়ে দিল।

আমি দাঁত মেজে মুখ হাত ধুয়ে আসলে হাবুল হেসে আমাকে এক গ্লাস শরবত এগিয়ে দিল। বলল নে খা, বল হবে। লাল রং তার। তার পরেই ফিক করে একটা হাসি দিল। হাসি চাপতে গিয়ে লোকে যে হাসিটা দেয় তাই।

খুবই পরিচিত, খুবই পরিচিত লাগছিল হাসিটা।

আমি বললাম, হাবুল তুই তুই কি?

হাবুল বললো, হ্যাঁ। বকুলদা করাত দিয়ে কাঠ কাটতে প্ল্যানটা করলো। আমিও লুফে নিলাম। পিচকারীর মুখটা দাদার কথা মতো বেড়ার ফুটো দিয়ে গলিয়ে টেবিল বরাবর ফোঁটা ফোঁটা শরবত ঢাললাম। দাদা গ্লাস সরিয়ে এনে যেখানটায় শরবত ঢালছিলাম সেখানে বসিয়ে দিল। তারপর তো দেখলাম তোরা সবাই..





যাহ কি সব ভুল বকছি, আমি তো তখন দুধ খেতে গিয়েছিলাম।

আমি চারপাশে তাকালাম, লাঠ্টাকে খুঁজছিলাম। চাইলে কেন যে জিনিষগুলো হাতের কাছে থাকে না। তবে খুঁজে নিয়ে যে হাবলুকে তাড়া করবো আমার সে শক্তি ছিল না।

হাবলু এবার কবিরাজি ভাষাতে বললো, নে খা। রহ আফজা। শক্তিবর্ধক, স্নায়ুশক্তিপ্রদায়নী সুরা।

হাবলু তারপর বললো, এই দেখ দাদা কি দিয়ে গেছে। দেখলাম হাবলুর হাতে সেই কোকিল বাঁশীটি। দাদাকে বলেছিলাম, এবার আসলে যেন আমার জন্যে কোকিল বাঁশী নিয়ে আসে। দেখলাম দাদা ভোলে নি। ঠিকই মনে করে এনেছে। তুই নে, তুইও বাজাবি।

হাবলু আমার হাতে এবার বাঁশীটি তুলে দিল।

আমার মনে হলো এটা কোন প্ল্যানচেট নয়, বড় একটা চীট প্ল্যান।





## Tagore's Ark of Noah

### Ayon Chakraborty

The most beautiful thing in the universe is creation. But when the creation faces the battle of destruction then the only way of going forward is to create again, and that can be only done when the Prakriti and the Purusha complement each other. In mythology during the time of world-engulfing flood, Noah's boat, the Ark of Noah, to create a new world after the darkness of destruction sailed with every pair of each animal species, as that can make the cycle of creation ongoing for ever, Similarly Tagore in his voyage of literature in his own Ark, he has always sailed with the different characters of Prakiti and Purush, the Female and the Male. the Shiva and the Shakti; This piece of article, 'Tagore's Ark of Noah', will try to sail you thru the layers of some of his creations to show how stunningly the togetherness of Prakiti and Purusha has been created and celebrated in Tagore's layered and multidimensional creations.

Since the dawn of creation, since when the light of knowledge and wisdom kissed the waves of mankind, even when there was no absolute start of time, in the infinite circle of creation and destruction only one truth Universe could never defy and that is the togetherness of Siva and Shakti, The male and the female. Together they can be friends, lovers, can combat with the world to amaze each other, can renovate, reinvent, repair him or her own self by the magical touch of each other, can travel thru the eternal journey of redemption & even can save the world from the ocean of chaos, and for all these, the nature asks for only one condition, that is togetherness of them, they can never be alone, to create a better world you need to be paired in Noahs Ark.

Now to analyse this closely with analogical examples from Tagore's world of literature, let's go thru three shades of three pairs of relationships and their journeys Tagore has created, and that explains some genuine truth of the universe.

Love & Sacrifice have grown together with Females and Males as a shell and shelter, since the time has started to travel.

In his dance drama Shyama, we see how a relationship of love and sacrifice and blindness over love manipulate human beings. Reliving the story will certainly help.

Bojroshen, a foreign merchant, is carrying a necklace of rare emeralds which he does not intend to trade but which he has bought for the girl of his dreams, whom he has not yet met. The Queen of the country through which he is travelling has heard of this necklace



and the King has sent his spies to find him. But Bojroshen refuses to sell the “Neclace of Indramani” to the King. Meantime, the queen’s precious royal ring gets stolen and inevitably, Bojroshen, being the only stranger in the state gets arrested by Kings’ men. Shyama, a court dancer, was walking on the streets, when Bojroshen rushes past her, hotly pursued by the King's Guard. She falls head over heels in love with Bojroshen, at the very fast gaze at the majestic and handsome Man- Bojroshen. Although she sees that he has been caught and handcuffed by the policeman. Shyama pleads the kings man

*“Tomaderero eki Bhranti, Ke shei Mohonokanti, Prohori Mori Mori, emon kore ki oke baandhe,  
dekhe je amar Pran Kaande”*

as she strongly feels that they have done a mistake and they have arrested a wrong guy. On the other hand, the tragic character of this drama Uttiyo has been a secret admirer of Shyama for many years but has never expressed his affection for her. When he hears that Shyama is seeking someone valiant enough to save Bojroshen from an unjust execution, he tells Shyama that he is prepared to take the blame on himself for the one she loves and through this sacrifice for Shyama, He- Uttiyo will be eternally remain attached and bonded with Shyama. With the blind and overwhelming love for Bojroshen in heart and mind, Shyama agrees to this horrifying offer for the innocent Uttiyo. Tagore wrote the song ‘Mayabono Biharini’ for this play and lines like

*Dur hote ami tare sa-dhi-bo  
Gopone biroho dore bandhibo  
or  
Mayabono biharini horini  
Gohono swapano sancharini  
Keno tare dhori bare koripon okaron*

...has been used in a perfect way, well, nothing less was expected from him. Back in the story Uttiyo surrenders to the King's Guard, showing the ring as proof that he was responsible for the theft.

Shyama visits Bojroshen in prison to let him know of his release, though she is troubled by her conscience. Bojroshen is delighted both to be free and to see her again. But Later Brojosen comes to know the truth and never forgave Shyama. Though Shyama was beautiful, her deeds could never win Brojosen’s heart. There was love but there was dearth of forgiveness, there was the pain in the Hero’s heart for not being able to accept Shyama who He too loved with his complete heart but they could not be together in life ever as the god of destiny never agrees the sacrifice of an innocent, truth Won over





everything... the love....still remained there....in Shyama's reprise, In Bojroshen's melancholic and repentant heart for rejecting Shyama and also platonic and unconditional love remained eternally in Uttiyo's heart for Shyama...forever after his sacrifice.

The cycle goes on... the time and the creator Tagore continues his voyage forward to play with the layers of relations between the Goddesses he has created and the Gods he has complemented with. Though personally in this era, It's a doubt, if the 1939 dance musical Brojosen in 2017 would have really disown Shayama for this. Well, that might raise eyebrows and initiate a whole new debate on the topic 'Evolution of Relationships and Feelings on the verge of ethics and compassion'. But now we have known how 'Love at First Sight' works and fails with a dramatic intervention of 'Karma'.

Let's float on a paradigm that sails in a completely different vision, where the mutual love was never from the beginning, as one of the players might be not so attractive, and then starts changing him or herself for the other player, the game of cupid goes on, starting of likings fall on place, but finally both of them fall in love with the actually inner self, the soul. To depict this Tagore took the story of Chitrāngadā and, in 1892, turned it into a dance drama.

.....in a state far away called Manipur in eastern part of India, the warriors of warriors Arjuna was out for a travel throughout the country as a part of his Brhamhacharja and the princess of the state the famous, courageous, brave warrior Chitrangada was out for hunting. Even Chitrandaga, then Kurupa, was one of the best warriors in her kingdom, she never cared about 'rupa', the beauty...as she had been raised as a Man and was the sole protector of Her State. But after meeting Arjuna , the magical touch of him made her reinventing herself as a girl. The famous rabindra sangeet, 'Badhu kon alo' was written under the light of the reinvention of Chitrangada.

*'Sundoro he, Sundoro he,  
Bor-mallokhani tabo amo bohe!  
Abogunthonochaya ghuchaye diye  
Hero lojjito smitomukho subho-aaloke'*

These lines were dedicated to Arjun, Tagore made the transformation from kurupa to Surupa with his lyrical expertise. The story went like this. Following excerpts from sources 'Arjuna is impressed by her fighting abilities but all along believes her to be a man. Chitrāngadā believes he could never love her the way she is. She receives a boon from Kamadeva, Hindu god of love, and transforms herself into a beautiful feminine



woman. When she meets Arjuna again, he can't help but fall in love with her. Though she believes that she has everything she wants in life, deep down she wishes that he could love her for her true self. When marauders come into her kingdom to take over the villages, Arjuna learns from the people of the kingdom that their princess is the greatest warrior around and they wonder why she isn't there to help protect them now. Arjuna is impressed by the story of this woman who seems to be his equal when it comes to fighting and longs to meet her. Chitrāngadā appears and saves her kingdom before revealing her true self to Arjuna. No longer in love with her just for her beauty, Arjuna marries Chitrāngadā.' Here even the relationship did not start with love and so called valentine quotient, the ending was happy though, unlike Shyama. This is the magic and this makes this two creatures Male and Female to praise accolade and compliment themselves in all possible way, .... after her transformation to a girl, even in his celibacy Arjun accepted surupa... the feminine and lustrous Chitrangada. Shayama was written after almost 50 years of Chitrāngadā, the time flows with Tagore's creation. The man was a magic himself. The way he expressed that deep inside the warrior Surupa never wanted to win Arjuna's heart with the outer beauty of her, she comes out again with her own self and commanded the world of uncertainty with her sword and shield, Arjuna, amazingly took shelter under her courage and surrendered himself to the original and real Chitrangada. And Tagore proved the very necessity of originality and acceptance in a true Man and Woman relationship that can never remain unshaken on the basis of cosmetic or ornamental magic.

We shape for partners, we sacrifice our identity, we flow like a river to meet the ocean, but unknowingly the ocean also waits for the river to meet him in. His use of 'Badhu Kon alo..' is mystic as well as heavenly. The aesthetic take away of the whole creation leaves us speechless and makes us worship the Noah of the World Literature, Mr. Rabindranath Tagore.

The time has taken its toll on everyone... so did the creator, the creator Tagore in his Ark of Noah has taken every pair who can complement each other, what if they do not love each other, what if they never sacrificed for each other, but a pair of pratiki and purush can even help each other to transform to a better life, to be reborn for the betterment of human kind, even to the extent to create a Ramayana, the holy Indian epic...drafted out of a dacoit Dashy Ratnakar.... The creator sails his Ark of noah thru a time when the world was engulfed by the fear of Dasyu Ratnakar .... Citation taken from sources, 'Composed in 1881, the opera was first performed at the Jorasanko Thakur Bari on 26 February 1881. Tagore himself played the role of Valmiki. It was staged in front of some





eminent literary personalities of contemporary Bengal like Bankim Chandra Chattopadhyay, Gooroodas Banerjee and Haraprasad Shastri. The first edition of the opera was also published this time. The second and final edition was published on 20 February 1886.' This was just a factual citation.

The music of this opera was a "fusion of classical, folk and European strains." The story narrates how Ratnakara, a robber chief turns into a great poet by the grace of Saraswati, the goddess of wisdom.

The context of Valmiki Pratibha, and why it has been written here. That little girl, whom Dasyu Ratnakar, wanted to sacrifice for Goddess Kali, could transform Ratnakar only by her innocence. In today's world, this analogy and the philosophy behind will solve many problems, and that is for the sake of the coming generation. Be it domestic violence or the cruelty of the society, we sacrifice our coming generations. The huge transformation of Dasyu Ratnakar was even appreciated by the Goddess Sarwasti and the famous verse of

*mā niṣāda pratiṣṭhāṁ tvamagamah śāsvatīḥ samāḥ |  
yat krauñcamithunādekaṁ avadhīḥ kāmamohitam*

("Oh hunter, may you repent for life and suffer, find no rest or fame, for you have killed one of the unsuspecting, devoted and loving krauñcha couple.) followed.

The creator Tagore sailing his voyage in the history of literature and wrote the truth again Since the dawn of creation, since when the light of knowledge and wisdom kissed the time lapse of mankind till today in all our lives the shivas can only complement the durgas, and the durgas can only complement the shivas, for a better life, for a better society for a better tomorrow and through a continued togetherness in various forms, in various ages and in various romantic or divine or tragic manifestations.





## Independence Day Made Special with Those Who Value Freedom The Most

Rwiddha Mitra

Independence Day celebrations are conducted aplomb across our country, every year, on August 15. Be it educational institutes, offices or housing societies, there's often a modus operandi followed to ensure that the day is made memorable.

We, at Aspire and Glee, decided to do it our own way as we spent the day with those innocent souls – the underprivileged kids of orphanage, for whom life is still a mystery with no clear solution in sight. This doesn't dampen their spirit though but actually makes them fight harder for their future.

The event, titled FATAFATI FOOTPATH was conducted to spend a day with the lovely kids of The Footpath Children Welfare Trust. With the kids laughing, singing, dancing and drawing, time flew on wings that day.

Although such trusts get funding from various sources but it isn't hard to realize that they are waging a battle within themselves to bring up the kids. We tried to make life a little easier for them by distributing new clothes, stationary items, basic medicines and mosquito nets to the children of the orphanage. After having distributed the necessary accessories we ensured that the kids have a hearty lunch wherein team Aspire and Glee also joined in to give them company.



The value of freedom is known only when we realize how much we have to strive for it. Scarred by difficulties, these kids know how much independence would mean to them. The country may be free but their lives would attain freedom only when they manage to



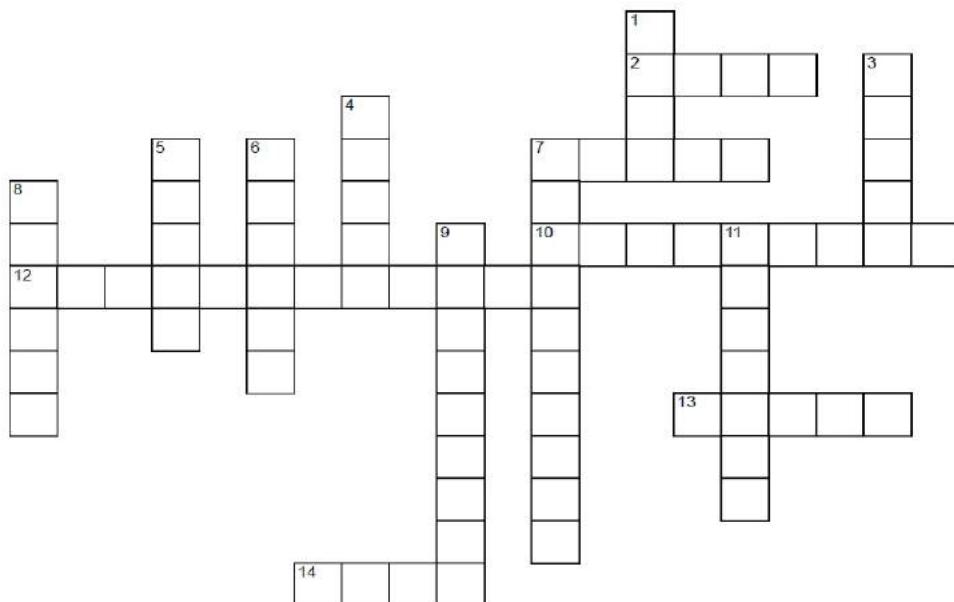
carve a decent future for themselves. Aspire and Glee tried to ensure that this Independence Day remained memorable for the lovely souls.

All these wouldn't have been possible without the funding provided by Stockholm Sarbajanin Puja Committee (SSPC) who went out of their way to support the cause without any persuasion. Without SSPC's help nothing would have been possible and we would like to wholeheartedly thank the committee for all their support.

Hopefully, the kids at the Footpath Children Welfare Trust morph into butterflies in the years to come.



## CROSWORD



### DOWN

- 1 The evil person
- 3 The prestigious prize
- 4 King of God
- 5 Country we love
- 6 Where we are
- 7 Another name of Ma Durga
- 8 Coldest city in Sweden
- 9 Name of a daughter of Ma Durga
- 11 The city of joy

### ACROSS

- 2 Name of a organization
- 7 Mother of Lord Ganesh
- 10 Capital of a Scandinavian country
- 12 He got nobel prize in 1913
- 13 Indian drum
- 14 This puja we celebrate during Diwali

Idea and Design -  
Arpita Biswas / Netra Mirajkar / Indranil Sinha



Välkommen till  
Restaurang Indian Curry House

Scheelegatan 6,  
112 2 3 Stockholm

Telefon 08- 650 20 24,  
650 20 25

ActionWave

HAPPY DURGA PUJA

আপনাদের উৎসবের দিনগুলি হয়ে উঠুক  
আনন্দমুখৰ  
সবাইকে শারদীয়াৰ শুভেচ্ছা।

CONTACT

Ricky D'Cruze  
021-475 54 02  
CEO & Business Development Manager

[www.actionwave.se](http://www.actionwave.se)



Stockholm Skyline

## *Six Good Reasons to Fly Air India* **DELHI ⇄ STOCKHOLM**

### **1 FLY NON STOP**

Fly the only non-stop airline between Delhi and Stockholm, thrice a week-Wednesdays, Fridays and Sundays.

### **2 BOEING 787 DREAMLINER**

Enjoy a luxurious and fatigue-free trip on the world's most advanced passenger aircraft with innovative features like lower cabin altitude, large dimmable windows, dynamic Led lighting, cleaner and healthier air and personal LCD screens.

Enjoy 180 degree flat bed and gourmet cuisine in the Dreamliner Business Class.

### **3 FLYING RETURNS PROGRAM**

Earn & redeem FR miles on the vast network of Air India or on our Star Alliance partner airline's networks.

### **4 FREE DOMESTIC CONNECTIONS**

Fly at no extra cost between Delhi and any one of the 9 Indian cities: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Pune, Mumbai and Trivandrum.

### **5 ONWARD CONNECTIONS**

Avail Air India flights at attractive fares between Stockholm and Asia Pacific Region over our Delhi Hub.

Through fares and connections with Scandinavian Airlines between Stockholm and 26 cities in Europe.

### **6 BAGGAGE ALLOWANCE**

For journeys originating between India & Sweden:

Business : 2 pieces of 32 kg each.

Economy : 2 pieces of 23 Kg each.

**Flying since 1932**

Call Toll Free: 1800 180 1407 or Visit [www.airindia.in](http://www.airindia.in) | Stay connected [/airindia](#) [@airindia\\_in](#) | Air India Mobile App

**Air India... Truly Indian** The most reputed Indian Aviation Brand